শান্তিনিকেতন

(প্রথম)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম
বোলপুর

মূল্য ।০ আনা

প্রকাশক—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশি হাউস্

কার্য্যালয়—৭৩।১, সুকিয়া ষ্ট্রীট,

শাখা দোকান—২০।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

শান্তিনিকেতন

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! সকাল বেলায় ত ঈশ্বরের আলো আপনি এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়—সমস্ত রাত্রির গভীর নিদ্রা একমুহূর্ত্তেই ভেঙে যায়। কিন্তু সন্ধ্যাবেলাকার মোহ কে ভাঙাবে! সমস্ত দীর্ঘদিনের চিন্তা ও কর্ম্ম হতে উৎক্ষিপ্ত একটা কুহকের আবেষ্টন, তার থেকে চিত্তকে নির্ম্মল উদার শান্তির মধ্যে বাহির করে আন্‌ব কি করে? সমস্ত দিনটা একটা মাকড়ষার মত জালের উপর জাল বিস্তার করে আমাদের নানাদিক থেকে

জড়িয়ে রয়েচে—চিরন্তনকে, ভূমাকে একেবারে আড়াল করে রয়েছে—এই সমস্ত জালকে কাটিয়ে চেতনাকে অনন্তের মধ্যে জাগ্রত করে তুল্‌ব কি করে! ওরে, "উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!"

দিন যখন নানা কর্ম্ম নানা চিন্তা নানা প্রবৃত্তির ভিতর দিয়ে একটি একটি পাক আমাদের চারদিকে জড়াতে থাকে, বিশ্ব এবং আমার আত্মার মাঝখানে একটা আবরণ গড়ে তুল্‌তে থাকে, সেই সময়েই যদি মাঝে মাঝে আমাদের চেতনাকে সতর্ক করতে না থাকি—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত," এই জাগরণের মন্ত্র যদি ক্ষণে ক্ষণে দিনের সমস্ত বিচিত্রব্যাপারের মাঝখানেই আমাদের অন্তরাত্মা থেকে ধ্বনিত হয়ে না উঠ্‌তে থাকে তাহলে পাকের পর পাক পড়ে ফাঁসের পর ফাঁস লেগে শেষ কালে আমাদের অসাড় করে ফেলে; তখন আবল্য থেকে নিজেকে টেনে বের করতে আমাদের

আর ইচ্ছাও থাকে না; নিজের চারিদিকের বেষ্টনকেই অত্যন্ত সত্য বলে জানি— তার অতীত যে উন্মুক্ত বিশুদ্ধ শাশ্বত সত্য তার প্রতি আমাদের বিশ্বাসই থাকে না, এমন কি তার প্রতি সংশয় অনুভব করবারও সচেষ্টতা আমাদের চলে যায়। অতএব সমস্ত দিন যখন নানা ব্যাপারের কলধ্বনি, তখন মনের গভীরতার মধ্যে একটি একতারা যন্ত্রে যেন বাজ্‌তে থাকে ওরে—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত!"

১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৫

সংশয়

সংশয়ের যে বেদনা সেও যে ভাল। কিন্তু যে প্রকাণ্ড জড়তার কুণ্ডলীর পাকে সংশয়কেও আবৃত করে থাকে—তাব হাত থেকে যেন মুক্তিলাভ করি। নিজের অজ্ঞতাসম্বন্ধে অজ্ঞানতার মত অজ্ঞান আর ত কিছু নেই। ঈশ্বরকে যে জানিনে, তাঁকে যে পাইনি এইটে যখন অনুভবমাত্র না করি তখনকার যে আত্মবিস্মৃত নিশ্চিন্ততা সেইটে থেকে উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত! সেই অসাড়তাকে বিচলিত করে গভীরতর বেদনা জেগে উঠুক্! আমি বুঝচিনে আমি পাচ্চিনে আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি এই বলে যেন কেঁদে উঠ্‌তে পারে। মনের সমস্ত তারে এই গান বেজে উঠুক্ "সংশয় তিমির মাঝে না হেরি গতি হে!"

আমরা মনে করি যে ব্যক্তি নাস্তিক সেই সংশয়ী কিন্তু আমরা যেহেতু ঈশ্বরকে স্বীকার করি অতএব আমরা আর সংশয়ী নই। বাস্, এই বলে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি—এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে যাদের সঙ্গে আমাদের মতে না মেলে তাদেরই আমরা পাষণ্ড বলি, নাস্তিক বলি, সংশয়াত্মা বলি। এই নিয়ে সংসারে কত দলাদলি, কত বিবাদ বিরোধ, কত শাসন পীড়ন তার আর অন্ত নাই। আমাদের দল এবং আমাদের দলের বাহির এই দুইভাগে মানুষকে বিভক্ত করে আমরা ঈশ্বরের অধিকারকে নিজের দলের বিশেষ সম্পত্তি বলে গণ্য করে আরামে বসে আছি। এসম্বন্ধে কোনো চিন্তা নেই সন্দেহ নেই।

এই বলে' কেবল কথাটুকুর মধ্যে ঈশ্বরকে স্বীকার করে আমরা সমস্ত সংসার থেকে তাঁকে নির্ব্বাসিত করে দেখ্‌চি। আমরা এমন ভাবে

গৃহে এবং সমাজে বাস করচি যেন সে গৃহে সে সমাজে ঈশ্বর নেই। আমরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই বিশ্বজগতের ভিতর দিয়ে এমন ভাবে চলে যাই যেন এ জগতে সেই বিশ্বভুবনেশ্বরের কোনো স্থান নেই। আমরা সকাল বেলায় আশ্চর্য্য আলোকের অভ্যুদয়ের মধ্যে জাগ্রত হয়ে সেই অদ্ভুত আবির্ভাবের মধ্যে তাঁকে দেখ্‌তে পাইনে এবং রাত্রিকালে যখন অনিমেষজাগ্রত নিঃশব্দ জ্যোতিষ্কলোকের মাঝখানে আমরা নিদ্রার গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করতে যাই তখন এই আশ্চর্য্য শয়নাগারের বিপুলমহিমান্বিত অন্ধকার শয্যা-তলের কোনো এক প্রান্তেও সেই বিশ্বজননীর নিস্তব্ধগম্ভীর স্নিগ্ধমূর্ত্তি অনুভব করিনে। এই অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত জগৎকে আমরা নিজের জমিজমা ঘর বাড়ির মধ্যেই সঙ্কীর্ণ করে দেখ্‌তে সঙ্কোচমাত্র বোধ করিনে। আমরা যেন ঈশ্বরের জগতে জন্মাইনি—নিজের

ঘরেই জন্মেছি—এখানে আমি আমি আমি ছাড়া আর কোনো কথাই নেই,—তবু আমরা বলি আমরা ঈশ্বরকে মানি, তাঁর সম্বন্ধে আমার মধ্যে কোনো সংশয় নেই।

আমার গৃহের মধ্যে সংসারের মধ্যে আমরা কোনো দিন এমন করে চলিনে যাতে প্রকাশ পায় যে এই গৃহের গৃহদেবতা তিনি, এই সংসার-রথকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেই মহাসারথী। আমিই ঘরের কর্তা, আমিই সংসারের সংসারী। ভোরের বেলা ঘুম ভাংবামাত্রই সেই চিন্তাই সুরু হয় এবং রাত্রে ঘুম এসে সেই চিন্তাকেই ক্ষণকালের জন্য আবৃত করে। "আমির" দ্বারাই এই গৃহ এই সংসার ঠাসা রয়েছে—কত দলিল, কত দস্তাবেজ, কত বিলিব্যবস্থা, কত বাদবিসম্বাদ! কিন্তু ঈশ্বর কোথায়! কেবল মুখের কথায়! আর কোথাও যে তিলধারণের স্থান নেই।

এই মুখের কথায় ঈশ্বরকে স্বীকার

করার মত নিজেকে ফাঁকি দেবার আর কি কিছু আছে! আমি এই সম্প্রদায়ভুক্ত, আমাদের এই মত, আমি এই কথা বলি—ঈশ্বরকে এইটুকুমাত্র ফাঁকির জায়গা ছেড়ে-দিয়ে তার পরে বাকি সমস্ত জায়গাটা অসঙ্কোচে নিজে জুড়ে বস্‌বার যে স্পর্দ্ধা, সেই স্পর্দ্ধা আপনাকে আপনি জানেনা বলেই এত ভয়ানক। এই স্পর্দ্ধা সংশয়ের সমস্ত বেদনাকে নিঃসাড় করে রাখে। আমরা যে জানিনে এটাও জান্‌তে দেয় না।

সংশয়ের বেদনা তখনি জেগে ওঠে যখন গোপনভাবে ঈশ্বর আমাদের চৈতন্যের একটা দিকে স্পর্শ করেন। তখন সংসারের মধ্যে থেকেও সংসার আমাদের কান্না থামাতে পারে না। এবং তাঁর দিকে দুইবাহু প্রসারিত করেও অন্ধকারে তাঁর নাগাল পাইনে। তখন এইটে জানা আরম্ভ হয় যে, যা পেয়েছি তাতে কোনোমতেই আমার চল্‌বে

না এবং যা না হলে আমার চলা অসম্ভব তা আমি কিছুতেই পাচ্চিনে। •এমন অসহ্য কষ্টের অবস্থা আর কিছুই নেই।

যখন প্রসবের সময় আসন্ন তখন গর্ভের শিশুকে একদিকে নাড়ি সম্পূর্ণ ছাড়চে না অন্যদিকে ভূমিষ্ঠ হবার বেগ তাকে আকর্ষণ করচে। মুক্তির সঙ্গে বন্ধনের টানাটানির তখনো কোনো মীমাংসা হয়নি। এই সময়ের বেদনাই জন্মদানের পূর্ব্বসূচনা, এই বেদনার অভাবকেই চিকিৎসক ভয় করেন।

যথার্থ সংশয়ের বেদনাও আত্মাকে সত্যের মধ্যে মুক্তিদানের বেদনা। সংসার একদিকে তাকে আপনার মধ্যে আবৃত আচ্ছন্ন করে রেখেছে বিমুক্ত সত্য অন্যদিকে তার অলক্ষ্যে তাকে আহ্বান করচে—সে অন্ধকারের মধ্যেই আছে অথচ আলোককে না জেনেই সে আলোকের আকর্ষণ অনুভব করচে। সে মনে করচে বুঝি তার এই ব্যাকুলতার কোনো

পরিণাম নেই, কেননা সে ত সম্মুখে পরিণামকে দেখ্‌তে পাচ্চে না, সে গর্ভস্থ শিশুর মত নিজের আবরণকেই চারদিকে অনুভব করচে।

আসুক্ সেই অসহ্য বেদনা—সমস্ত প্রকৃতি কাঁদ্‌তে থাক—সে কান্নার অবসান হবে। কিন্তু যে কান্না বেদনায় জেগে ওঠে নি, ফুটে ওঠেনি, জড়তার শত বেষ্টনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে—তার যে কোনো পরিণাম নেই। সে যে রক্তেমাংসে অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে রয়েই গেল—তার ভার যে চব্বিশঘণ্টা নাড়ীতে নাড়ীতে বহন করে বেড়াতে হবে।

যে দিন সংশয়ের ক্রন্দন আমাদের মধ্যে সত্য হয়ে ওঠে, সেদিন আমরা সম্প্রদায়ের মত, দর্শনের তর্ক ও শাস্ত্রের বাক্য নিয়ে আরাম পাইনে; সেদিন আমরা একমুহূর্ত্তেই বুঝতে পারি প্রেম ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই—সেদিন আমাদের প্রার্থনা

এই হয় যে, "প্রেম-আলোকে প্রকাশো জগপতি হে!"

জ্ঞানের প্রকাশে আমাদের সংশয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর হয় না। আমরা জেনেও জানিনে কখন্? যখন আমাদের মধ্যে প্রেমের প্রকাশ হয় না। একবার ভেবে দেখনা এই পৃথিবীতে কত শত সহস্র লোক আমাকে বেষ্টন করে আছে। তাদের যে জানিনে তা নয়, কিন্তু তারা আমার পক্ষে কিছুই নয়। সংসারে আমি এমন ভাবে চলি যেন এই অগণ্য লোক তাদের সুখদুঃখ নিয়ে নেই। তবে কারা আছে? যারা আমার আত্মীয় স্বজন, আমার প্রিয়ব্যক্তি, তারাই অগণ্য জীবকে ছাড়িয়ে আছে। এই কয়েকটি লোকই আমার সংসার। কেন না এদেরই আমি প্রেমের আলোতে দেখেছি। এদেরই আমি কমবেশি পরিমাণে আমার আত্মারই সমান করে দেখেছি। আমার আত্মা যে সত্য,

আত্মপ্রেমে সেটা আমার কাছে একান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সেই প্রেম যাদের মধ্যে প্রসারিত হতে পেরেছে তাদেরই আমি আত্মীয় বলে জানি—তাই তাদের সম্বন্ধে আমার কোনো সংশয় নেই, তারা আমার পক্ষে অনেকটা আমারই মত সত্য।

ঈশ্বর যে আছেন এবং সর্ব্বত্রই আছেন এ কথাটা যে আমার জানার অভাব আছে তা নয় কিন্তু আমি অহরহ সম্পূর্ণ এমন ভাবেই চলি যেন তিনি কোনোখানেই নেই। এর কারণ কি? তাঁর প্রতি আমার প্রেম জন্মে নি, সুতরাং তিনি থাক্‌লেই বা কি না থাক্‌লেই বা কি? তাঁর চেয়ে আমার নিজের ঘরের অতি তুচ্ছ বস্তুও আমার কাছে বেশি করে আছে। প্রেম নেই বলেই তাঁর দিকে আমাদের সমস্ত চোখ চায় না, আমাদের সমস্ত কান যায় না, আমাদের সমস্ত মন খোলে না। এই জন্যেই যিনি সকলের চেয়ে আছেন

তাঁকেই সকলের চেয়ে পাইনে—তাই এমন একটা অভাব জীবনে থেকে যায় যা আর কিছুতেই কোনোমতেই পোরাতে পারে না। ঈশ্বর থেকেও থাকেন না—এত বড় প্রকাণ্ড না থাকা আমাদের পক্ষে আর কি আছে! এই না থাকার ভারে আমরা প্রতিমুহূর্ত্তেই মরচি। এই না থাকার মানে আর কিছুই না, আমাদের প্রেমের অভাব। এই না থাকারই শুষ্কতায় জগতের সমস্ত লাবণ্য মারা গেল, জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট হল। যিনি আছেন তিনি নেই এত বড় ক্ষতি কি দিয়ে পূরণ হবে! কিছুতেই কিছু হচ্চে না। দিনে রাত্রে এই জন্যেই যে গেলুম। সব জানি সব বুঝি, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ—

প্রেম-আলোকে প্রকাশো জগপতি হে!

২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩১৫

অভাব

ঈশ্বরকে যে আমরা দিন রাত্রি বাদ দিয়ে চলচি তাতে আমাদের সাংসারিক ক্ষতি যদি শিকি পয়সাও হত তাহলে তখনি সতর্ক হয়ে উঠ্‌তুম। কিন্তু সে বিপদ নেই; সূর্য্য আমাদের আলো দিচ্চে পৃথিবী আমাদের অন্ন দিচ্চে, বৃহৎ লোকালয় তার সহস্র নাড়ী দিয়ে আমাদের সহস্র অভাব পূরণ করে চলেচে। তবে সংসারকে ঈশ্বরবর্জ্জিত করে আমাদের কি অভাব হচ্চে! হায়, যে অভাব হচ্চে তা যতক্ষণ না জান্‌তে পারি ততক্ষণ আরামে নিঃসংশয়ে থাকি এবং সচ্ছল সংসারের মধ্যে বাস করে' মনে করি আমরা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি।

কিন্তু ক্ষতিটা কি হয় তা কেমন করে বোঝানো যেতে পারে?

এইখানে দৃষ্টান্তস্বরূপে আমার একটি স্বপ্নের কথা বলি। আমি নিতান্ত বালক কালে মাতৃহীন। আমার বড় বয়সের জীবনে মার অধিষ্ঠান ছিল না। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌লুম আমি, যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি। গঙ্গার ধারের বাগানবাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন ত আছেন—তাঁর আবির্ভাব ত সকল সময়ে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়ে তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে একমুহূর্তে আমার হঠাৎ কি হল জানিনে—আমার মনে এই কথাটা জেগে উঠ্‌ল যে মা আছেন। তখনি তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বল্লেন "তুমি এসেচ ?"

এইখানেই স্বপ্ন ভেঙে গেল। আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লুম—মায়ের বাড়িতেই বাস

করচি, তাঁর ঘরের দুয়ার দিয়েই দশবার করে আনাগোনা করি—তিনি আছেন এটা জানি সন্দেহ নেই কিন্তু যেন নেই এম্‌নি ভাবেই সংসার চল্‌চে। তাতে ক্ষতিটা কি হচ্চে! তাঁর ভাঁড়ারের দ্বার তিনি বন্ধ করেন নি, তাঁর অন্ন তিনি পরিবেষণ করচেন, যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনো তাঁর পাখা আমাকে বীজন করচে। কেবল ঐটুকু হচ্চে না, তিনি আমার হাতটি ধরে বল্‌চেন না, তুমি এসেচ! অন্ন জল ধন জন সমস্তই আছে কিন্তু সেই স্বরটি সেই স্পর্শ টি কোথায়! মন যখন সম্পূর্ণ জেগে উঠে সেইটিকেই চায় এবং চেয়ে যখন না পায়, কেবল উপকরণভরা ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়ায় তখন অন্নজল তার আর কিছুতেই রোচে না।

একবার ভাল করে ভেবে দেখ, জগতে কোনো জিনিষের কাছে কোনো মানুষের কাছে যাওয়া আমাদের জীবনে অল্পই ঘটে। পরম আত্মীয়ের নিকট দিয়েও আমরা প্রত্যহ

আনাগোনা করি বটে কিন্তু দৈবাৎ একমুহূর্ত্ত তার কাছে গিয়ে পৌঁছই। কত দিন তার সঙ্গে নিভৃতে কথা কয়েছি এবং সকাল সন্ধ্যার আলোকে একসঙ্গে বেড়িয়েছি কিন্তু এর মধ্যে হয় ত সকলের চেয়ে কেবল একদিনের কথা মনে পড়ে যেদিন হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে মনে হয়েছে আমি তার কাছে এসেছি। এমন শত সহস্র লোক আছে যারা সমস্ত জীবনে একবারও কোনো জিনিষের কোনো মানুষের কাছে আসে নি। জগতে জন্মেছে কিন্তু জগতের সঙ্গে তাদের অব্যবহিত সংস্পর্শ ঘটে নি। ঘটে নি যে, এও তারা একেবারেই জানে না। তারা যে সকলের সঙ্গে হাসচে খেলচে গল্পগুজব করচে, নানা লোকের সঙ্গে দেনা পাওনা আনাগোনা চল্‌চে তারা ভাবচে এই ত আমি সকলের সঙ্গে আছি। এইরূপ সঙ্গে থাকার মধ্যে সঙ্গটা যে কতই যৎসামান্য সে তার বোধের অতীত।

আত্মার দৃষ্টি

বাল্যকালে আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আমি তা জান্‌তুম না। আমি ভাবতুম দেখা বুঝি এই রকমই—সকলে বুঝি এই পরিমাণেই দেখে। একদিন দৈবাৎ লীলাচ্ছলে আমার কোন সঙ্গীর চষমা নিয়ে চোখে পরেই দেখি, সব জিনিষ স্পষ্ট দেখা যাচ্চে। তখন মনে হল আমি যেন হঠাৎ সকলের কাছে এসে পড়েছি, সমস্তকে এই যে স্পষ্ট দেখা ও কাছে পাওয়ার আনন্দ, এর দ্বারা বিশ্বভুবনকে যেন হঠাৎ দ্বিগুণ করে লাভ করলাম—অথচ এতদিন যে আমি এত লোকসান বহন করে বেড়াচ্চি তা জান্‌তুমই না।

এ যেমন চোখ দিয়ে কাছে আসা, তেমনি আত্মা দিয়ে কাছে আসা আছে। সেই রকম করে যারই কাছে আসি সেই আমার হাত

তুলে ধরে বলে তুমি এসেচ ! এই যে জল বায়ু চন্দ্র সূর্য্য, আমাদের পরমবন্ধু, এরা আমাদের নানা কাজ করচে, কিন্তু আমাদের হাত ধরচে না, আনন্দিত হয়ে বলচে না, তুমি এসেছ ! যদি তাদের তেমনি কাছে যেতে পারতুম, যদি তাদের সেই স্পর্শ সেই সম্ভাষণ লাভ করতুম তাহলে মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝতে পারতুম তাদের কৃত সমস্ত উপকারের চেয়ে এইটুকু কত বড়। মানুষের মধ্যে আমি চিরজীবন বাস করলুম কিন্তু মানুষ আমাকে স্পর্শ করে বলচে না, তুমি এসেচ ! আমি একটা আবরণের মধ্যে আবৃত হয়ে পৃথিবীতে সঞ্চরণ করচি। ডিমের মধ্যে পক্ষীশিশু যেমন পৃথিবীতে জন্মেও জন্মলাভ করে না এও সেই রকম।

এই অস্ফুট চেতনার ডিমের ভিতর থেকে জন্মলাভই আধ্যাত্মিক জন্ম। সেই জন্মের দ্বারাই আমরা দ্বিজ হব। সেই জন্মই জগতে যথার্থরূপে জন্ম—জীবচৈতন্যের

বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে জন্ম। তখনি পক্ষীশিশু পক্ষীমাতার পক্ষপুটের সম্পূর্ণ সংস্পর্শ লাভ করে—তখনি মানুষ সর্ব্বত্রই সেই সর্ব্বকে প্রাপ্ত হয়। সেই প্রাপ্ত হওয়া যে কি আশ্চর্য্য সার্থকতা কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তা আমরা জানিনে কিন্তু জীবনে কি ক্ষণে ক্ষণে তার আভাসমাত্রও পাইনে!

আধ্যাত্মিকতায় আমাদের আর কিছু দেয় না আমাদের ঔদাসীন্য আমাদের অসাড়তা ঘুচিয়ে দেয়। অর্থাৎ তখনি আমরা চেতনার দ্বারা চেতনাকে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে পাই। সেই রকম করে যখন পাই তখন আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে সমস্তই তাঁর আনন্দরূপ।

তৃণ থেকে মানুষ পর্য্যন্ত জগতে যেখানেই আমার চিত্ত উদাসীন থাকে সেখানেই আমাদের আধ্যাত্মিকতা সীমাবদ্ধ হয়েছে এটি জানতে হবে। আমাদের চেতনা আমাদের

আত্মা যখন সর্ব্বত্র প্রসারিত হয় তখন জগতের সমস্ত সত্তাকে আমাদের সত্তার দ্বারাই অনুভব করি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়, বুদ্ধির দ্বারা নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা নয়। সেই পরিপূর্ণ অনুভূতি একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই সমুখের গাছটিকেও যদি সেই সত্তারূপে গভীররূপে অনুভব করি তবে যে আমার সমস্ত সত্তা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই দেখিনে বলে একে চোখ দিয়ে দেখবামাত্র এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই বলে এর সম্মুখ দিয়ে চলে যাই, এই গাছের সত্যে আমার সত্যকে জাগিয়ে তুলে আমাকে আনন্দের অধিকারী করে না। মানুষকেও আমরা আত্মা দিয়ে দেখিনে—ইন্দ্রিয় দিয়ে যুক্তি দিয়ে স্বার্থ দিয়ে সংসার দিয়ে সংস্কার দিয়ে দেখি—তাকে পরিবারের মানুষ, বা প্রয়োজনের মানুষ, বা নিঃসম্পর্ক মানুষ বা কোনো একটা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত মানুষ বলেই দেখি—

সুতরাং সেই সীমাতেই গিয়ে আমার পরিচয় ঠেকে যায়—সেই খানেই দরজা রুদ্ধ—তার ভিতরে আর প্রবেশ করতে পারিনে—তাকেও আত্মা বলে আমার আত্মা প্রত্যক্ষ ভাবে সম্ভাষণ করতে পারে না। যদি পারত তবে পরস্পর হাত ধরে বল্‌ত তুমি এসেচ!

আধ্যাত্মিক সাধনার যে চরম লক্ষ্য কি তা উপনিষদে স্পষ্ট লেখা আছে—"তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানং সর্ব্ব-মেবাবিশন্তি"—ধীর ব্যক্তিরা সর্ব্বব্যাপীকে সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্ব্বত্রই প্রবেশ করেন। এই যে সর্ব্বত্র প্রবেশ করবার ক্ষমতাই শেষ ক্ষমতা। প্রবেশ করার মানেই হচ্ছে যুক্তাত্মা হওয়া। যখন সমস্ত পাপের সমস্ত অভ্যাসের সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের আত্মা সর্ব্বত্রই আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয় তখনি সে সর্ব্বত্র প্রবেশ করে—সেই আত্মায় গিয়ে পৌঁছলে সে দ্বারে এসে

ঠেকে—সে মৃত্যুতেই আবদ্ধ হয়, অমৃতং যদ্বিভাতি, অমৃতরূপে যিনি সকলের মধ্যেই প্রকাশমান সেই অমৃতের মধ্যে আত্মা পৌঁছতে পারে না—সে আর সমস্তই দেখে কেবল আনন্দরূপমমৃতং দেখে না।

এই যে আত্মা দিয়ে বিশ্বের সর্ব্বত্র আত্মার মধ্যে প্রবেশ করা এই ত আমাদের সাধনার লক্ষ্য। প্রতিদিন এই পথেই যে আমরা চলচি এটা ত আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। অন্ধভাবে জড়ভাবে ত এটা হবে না। চেতন ভাবেই ত চেতনার বিস্তার হতে থাকবে। প্রতিদিন ত আমাদের বুঝতে হবে একটু একটু করে আমাদের প্রবেশ পথ খুলে যাচ্ছে আমাদের অধিকার ব্যাপ্ত হচ্চে। সকলের সঙ্গে বেশি করে মিলতে পাচ্চি, অল্পে অল্পে সমস্ত বিরোধ কেটে যাচ্চে—মানুষের সঙ্গে মিলনের মধ্যে, সংসারের কর্ম্মের মধ্যে, ভূমার প্রকাশ প্রতিদিন অব্যাহত

হয়ে আস্‌চে। আমিত্ব বলে যে সুদুর্ভেদ্য আবরণ আমাকে সকলের সঙ্গে অত্যন্ত বিভক্ত করে রেখেছিল তা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আস্‌চে, ক্রমেই তা স্বচ্ছ হয়ে তার ভিতর থেকে নিখিলের আলো ক্রমে ক্রমে স্ফুটতর হয়ে দেখা যাচ্চে—আমি আমার দ্বারা কাউকে আচ্ছন্ন কাউকে বিকৃত করচিনে, আমার মধ্যে অন্যের এবং অন্যের মধ্যে আমার বাধা প্রত্যহই কেটে যাচ্চে।

পাপ

এমনি করে আত্মা যখন আত্মাকে চায় আর কিছুতেই তাকে থামিয়ে রাখ্‌তে পারে না তখনি পাপ জিনিষটা কি তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি। আমাদের চৈতন্য যখন বরফগলা ঝরণার মত ছুটে বেরতে চায় তখনি পাপের বাধাকে সে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে—এক মুহূর্ত্ত আর তাকে ভুলে থাক্‌তে পারে না—তাকে ক্ষয় করবার জন্যে তাকে সরিয়ে ফেলবার জন্যে আমাদের পীড়িত চৈতন্য পাপের চারিদিকে ফেনিল হয়ে উঠ্‌তে থাকে। বস্তুত আমাদের চিত্ত যখন চল্‌তে থাকে তখন সে তার গতির সংঘাতেই ছোট নুড়িটিকেও অনুভব করে, কিছুই তার আর অগোচর থাকে না।

তার পূর্ব্বে পাপ পুণ্যকে আমরা সামাজিক

ভালমন্দ সুবিধা অসুবিধার জিনিষ বলেই জানি। চরিত্রকে এমন করে গড়ি যাতে লোকসমাজের উপযুক্ত হই, যাতে ভদ্রতার আদর্শ রক্ষা হয়। সেইটুকুতে কৃতকার্য্য হলেই আমাদের মনে আর কোন সঙ্কোচ থাকে না; আমরা মনে করি চরিত্রনীতির যে উপযোগিতা তা আমার দ্বারা সিদ্ধ হল।

এমন সময় একদিন যখন আত্মা জেগে ওঠে, জগতের মধ্যে সে আত্মাকে খোঁজে তখন সে দেখ্‌তে পায় যে শুধু ভদ্রতার কাজ নয়, শুধু সমাজ রক্ষা করা নয়—প্রয়োজন আরো বড়, বাধা আরো গভীর। উপর থেকে কেটে কুটে রাস্তা সাফ করে দিয়েছি, সংসারের পথে কোনো বাধা দিচ্চে না, কারো চোখে পড়চে না; কিন্তু শিকড়গুলো সমস্তই ভিতরে রয়ে গেছে—তারা পরস্পরে ভিতরে ভিতরে জড়াজড়ি করে একেবারে জাল বুনে রেখেছে, আধ্যাত্মিক চাষ-আবাদে সেখানে পদে পদে

ঠেকে যেতে হয়। অতি ক্ষুদ্র অতি সূক্ষ্ম শিকড়টিও জড়িয়ে ধরে, আবরণ রচনা করে। তখন পূর্ব্বে যে পাপটি চোখে পড়েনি তাকেও দেখ্‌তে পাই এবং পাপ জিনিষটা আমাদের পরম সার্থকতার পথে যে কি রকম বাধা তাও বুঝ্‌তে পারি। তখন মানুষের দিকে না তাকিয়ে কোনো সামাজিক প্রয়োজনের দিকে না তাকিয়ে পাপকে কেবল পাপ বলেই সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে ঠেলা দিতে থাকি— তাকে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠে। সে যে চরম মিলনের, পরম প্রেমের পথ দলবল নিয়ে জুড়ে বসে আছে—তার সম্বন্ধে অন্যকে বা নিজেকে ফাঁকি দেওয়া আর চল্‌বে না— লোকের কাছে ভাল হয়ে আর কোন সুখ নেই—তখন সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে সেই নির্ম্মল স্বরূপকে বল্‌তে হবে, বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব—সমস্ত পাপ দূর কর—একেবারে বিশ্বদুরিত—সমস্ত পাপ—একটুও বাকি থাকলে

চল্‌বে না—কেননা তুমি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং, আত্মা তোমাকেই চায়—সেই তার একমাত্র যথার্থ চাওয়া, সেই তার শেষ চাওয়া। হে সর্ব্বগ, তোমাকে, সর্ব্বতঃ প্রাপ্য, সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হয়, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করব সেই আশ্চর্য্য সৌভাগ্যের ধারণাও এখন আমার মনে হয় না কিন্তু এই অনুগ্রহটুকু করতে হবে, যে, তোমার পরিপূর্ণ প্রকাশের অধিকারী নাই হই তবু আমার রুদ্ধদ্বারের ছিদ্র দিয়ে তোমার সেইটুকু আলোক আসুক যে আলোকে ঘরের আবদ্ধ অন্ধকারকে আমি অন্ধকার বলে জান্‌তে পারি। রাত্রে দ্বার জানালা বন্ধ করে অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে ছিলুম। সকাল বেলায় দ্বারের ফাঁক দিয়ে যখন আলো ঢুকল তখন জড়শয্যায় পড়ে থেকে হঠাৎ বাইরের সুনির্ম্মল প্রভাতের আবির্ভাব আমার তন্দ্রালস চিত্তকে আঘাত করল। তখন তপ্তশয্যার তাপ অসহ্য বোধ হল,

তখন নিজের নিঃশ্বাস-কলুষিত বদ্ধ ঘরের বাতাস আমার নিঃশ্বাস রোধ করতে লাগল; তখন ত আর থাকতে পারা গেল না; তখন উন্মুক্ত নিখিলের স্নিগ্ধতা নির্ম্মলতা পবিত্রতা, সমস্ত সৌন্দর্য্য সৌগন্ধ্য সঙ্গীতের আভাস আমাকে আহ্বান করে বাইরে নিয়ে এল। তুমি তেমনি করে আমার আবরণের কোনো দুই একটা ছিদ্রের ভিতর দিয়ে তোমার আলোকের দূতকে তোমার মুক্তির বার্ত্তাবহকে প্রেরণ কর—তাহলেই নিজের আবদ্ধতার তাপ এবং কলুষ এবং অন্ধকার আমাকে আর সুস্থির হতে দেবেনা, আরামের শয্যা আমাকে দগ্ধ করতে থাকবে, তখন বলতেই হবে যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্!

২৫শে অগ্রহায়ণ

দুঃখ

আমাদের উপাসনার মন্ত্রে আছে, নমঃ সম্ভবায়চ ময়োভবায়চ—সুখকরকে নমস্কার করি, কল্যাণকরকে নমস্কার। কিন্তু আমরা সুখকরকেই নমস্কার করি, কল্যাণকরকে সব সময়ে নমস্কার করতে পারিনে। কল্যাণকর যে শুধু সুখকর ন'ন, তিনি যে দুঃখকর। আমরা সুখকেই তাঁর দান বলে জানি আর দুঃখকে কোনো দুর্দ্দৈবকৃত বিড়ম্বনা বলেই জ্ঞান করি।

এই জন্যে দুঃখভীরু বেদনাকাতর আমরা দুঃখ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে নানা প্রকার আবরণ রচনা করি, আমরা কেবলি লুকিয়ে থাকতে চাই। তাতে কি হয়? তাতে সত্যের পূর্ণ সংস্পর্শ থেকে আমরা বঞ্চিত হই।

ধনী বিলাসী সমস্ত আয়াস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কেবল আরামের মধ্যে পরিবৃত হয়ে থাকে। তাতে কি হয়? তাতে সে নিজেকে পঙ্গু করে ফেলে; নিজের হাত-পায়ের উপর তার অধিকার থাকে না, যে সমস্ত শক্তি নিয়ে সে পৃথিবীতে জন্মেছিল সেগুলি কর্ম্ম অভাবে পরিণত হতে পারে না, মুষড়ে যায়, বিগ্‌ড়ে যায়। স্বরচিত আবরণের মধ্যে সে একটি কৃত্রিম জগতে বাস করে। কৃত্রিম জগৎ আমাদের প্রকৃতিকে কখনই তার সমস্ত স্বাভাবিক খাদ্য জোগাতে পারে না, এই জন্যে সে অবস্থায় আমাদের স্বভাব একটি ঘরগড়া পুতুলের মত হয়ে ওঠে, পূর্ণতালাভ করে না।

দুঃখের আঘাত থেকে আমাদের মনকে ভয়ে ভয়ে কেবলি বাঁচিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা করলে জগতে আমাদের অসম্পূর্ণভাবে বাস করা হয় সুতরাং তাতে কখনই আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শক্তির পরিণতি হয় না।

পৃথিবীতে এসে যে ব্যক্তি দুঃখ পেলে না সে লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে তার সব পাওনা পেলে না—তার পাথেয় কম পড়ে গেল।

যাদের স্বভাব অতিবেদনাশীল, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই তাদের বাঁচিয়ে চলে ;—সে ছোটকে বড় করে তোলে বলেই লোকে কেবলি বলে কাজ নেই—তার সম্বন্ধে লোকের কথাবার্ত্তা ব্যবহার কিছুই স্বাভাবিক হয় না। সে, সব কথা শোনে না কিম্বা ঠিক কথা শোনে না—তার যা উপযুক্ত পাওনা তা সে সবটা পায় না কিম্বা ঠিক মত পায় না। এতে তার মঙ্গল হতেই পারে না। যে ব্যক্তি বন্ধুর কাছ থেকে কখনো আঘাত পায় না কেবলি প্রশ্রয় পায় সে হতভাগ্য বন্ধুত্বের পূর্ণ আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়—বন্ধুরা তার সম্বন্ধে পূর্ণরূপে বন্ধু হয়ে উঠ্‌তে পারে না।

জগতে এই যে আমাদের দুঃখের পাওনা এ যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত হবেই তা নয়। যাকে

আমরা অন্যায় বলি অবিচার বলি তাও আমাদের গ্রহণ করতে হবে—অত্যন্ত সাবধানে সূক্ষ্মহিসাবের খাতা খুলে কেবলমাত্র ন্যায্যটুকুর ভিতর দিয়েই নিজেকে মানুষ করে তোলা—সে ত হয়েও ওঠে না এবং হলেও তাতে আমাদের মঙ্গল হয় না। অন্যায় এবং অবিচারকেও আমরা উপযুক্ত ভাবে গ্রহণ করতে পারি এমন আমাদের সামর্থ্য থাকা চাই।

পৃথিবীতে আমাদের ভাগে যে সুখ পড়ে তাও কি একেবারে ঠিক হিসাবমত পড়ে, অনেক সময়েই কি আমরা গাঁঠের থেকে যা দাম দিয়েছি তার চেয়ে বেশি খরিদ করে ফেলিনে? কিন্তু কখনো ত মনে করিনে আমি তার অযোগ্য! সবটুকুইত দিব্য অসঙ্কোচে দখল করি! দুঃখের বেলাতেই কি কেবল ন্যায় অন্যায়ের হিসাব মেলাতে হবে? ঠিক হিসাব মিলিয়ে কোনো জিনিষ যে আমরা পাইনে।

তার একটি কারণ আছে। গ্রহণ এবং বর্জ্জনের—ভিতর দিয়েই আমাদের প্রাণের ক্রিয়া চল্‌তে থাকে—কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ এই দুটো শক্তিই আমাদের পক্ষে সমান গৌরবের—আমাদের প্রাণের আমাদের বুদ্ধির আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের আমাদের মঙ্গল প্রবৃত্তির, বস্তুত আমাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠতার মূল ধর্ম্মই এই যে সে যে কেবলমাত্র নেবে তা নয় সে ত্যাগও করবে।

এই জন্যই আমাদের আহার্য্য পদার্থে ঠিক হিসাবমত আমাদের প্রয়োজনের উপকরণ থাকে না তাতে যেমন খাদ্য অংশ আছে তেমনি অখাদ্য অংশও আছে। এই অখাদ্য অংশ শরীর পরিত্যাগ করে। যদি ঠিক ওজন মত নিছক খাদ্য পদার্থ আমরা গ্রহণ করি তাহলে আমাদের চলে না, শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হয়। কারণ কেবল কি আমাদের পাকশক্তি ও পাকযন্ত্র আছে?—আমাদের ত্যাগশক্তি ও ত্যাগযন্ত্র

আছে—সেই শক্তি সেই যন্ত্রকেও আমাদের কাজ দিতে হবে, তবেই গ্রহণ বর্জ্জনের সামঞ্জস্যে প্রাণের পূর্ণতাসাধন ঘটবে।

সংসারে তেমনি আমরা যে কেবলমাত্র ন্যায্যটুকু পাব, কেউ আমাদের প্রতি কোনো অবিচার করবে না এও বিধান নয়। সংসারে এই ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায় মিশ্রিত থাকা আমাদের চরিত্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়ার মত আমাদের চরিত্রের এমন একটি সহজ ক্ষমতা থাকা চাই যাতে আমাদের যেটুকু প্রাপ্য সেটুকু অনায়াসে গ্রহণ করি এবং যেটুকু ত্যাজ্য সেটুকু বিনাক্ষোভে ত্যাগ করতে পারি।

অতএব দুঃখ এবং আঘাত ন্যায্য হোক বা অন্যায্য হোক তার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে নিঃশেষে বাঁচিয়ে চলবার অতিচেষ্টায় আমাদের মনুষ্যত্বকে দুর্ব্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে।

এই ভীরুতায় শুধুমাত্র বিলাসিতার পেলবতা

ও দৌর্ব্বল্য জন্মে তা নয় যে সমস্ত অতিবেদনা-শীল লোক আঘাতের ভয়ে নিজেকে আবৃত করে তাদের শুচিতা নষ্ট হয়—আবরণের ভিতরে ভিতরে তাদের অনেক মলিনতা জম্‌তে থাকে ;—যতই লোকের ভয়ে তারা সেগুলো লোকচক্ষুর সাম্‌নে বের করতে না চায় ততই সেগুলো দূষিত হয়ে উঠে স্বাস্থ্যকে বিকৃত করতে থাকে। পৃথিবীর নিন্দা অবিচার দুঃখকষ্টকে যারা অবাধে অসঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারে তারা কেবল বলিষ্ঠ হয় তা নয় তারা নির্ম্মল হয়, অনাবৃত জীবনের উপর দিয়ে জগতের পূর্ণসংঘাত লেগে তাদের কলুষ ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে।

অতএব সমস্ত মনপ্রাণ নিয়ে প্রস্তুত হও—যিনি সুখকর তাঁকে প্রণাম কর এবং যিনি দুঃখকর তাঁকেও প্রণাম কর—তা হলেই স্বাস্থ্যলাভ করবে শক্তিলাভ করবে—যিনি শিব যিনি শিবতর তাঁকেই প্রণাম করা হবে।

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৫।
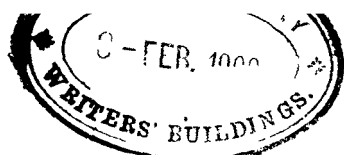
ত্যাগ

প্রতিদিন প্রাতে আমরা যে এই উপাসনা করচি যদি তার মধ্যে কিছু সত্য থাকে তবে তার সাহায্যে আমরা প্রত্যহ অল্পে অল্পে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হচ্চি। নিতান্তই প্রস্তুত হওয়া চাই, কারণ, সংসারের মধ্যে একটি ত্যাগের ধর্ম্ম আছে, তার বিধান অমোঘ। সে আমাদের কোথাও দাঁড়াতে দিতে চায় না; সে বলে কেবলি ছাড়তে হবে এবং এগতে হবে। এমন কোথাও কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চিনে যেখানে পৌঁছে বল্‌তে পারি এই খানেই সমস্ত সমাপ্ত হল, পরিপূর্ণ হল, অতএব এখান থেকে আর কোনোকালেই নড়ব না।

সংসারের ধর্ম্মই যখন কেবল ধরে রাখা নয়, সরিয়ে দেওয়া, এগিয়ে দেওয়া—তখন তারই সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার সামঞ্জস্য সাধন

না করলে দুটোতে কেবলি ঠোকাঠুকি হতে থাকে। আমরা যদি কেবলি বলি আমরা থাক্‌ব আমরা রাখ্‌ব আর সংসার বলে তোমাকে ছাড়তে হবে চল্‌তে হবে তাহলে বিষম কষ্ট উৎপন্ন হতে থাকে। আমাদের ইচ্ছাকে পরাস্ত হতে হয়—যা আমরা ছাড়তে চাইনে তা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। অতএব আমাদের ইচ্ছাকেও এই বিশ্বধর্ম্মের সুরে বাঁধতে হবে।

বিশ্বধর্ম্মের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাকে মেলাতে পারলেই আমরা বস্তুত স্বাধীন হই। স্বাধীনতার নিয়মই তাই। আমি স্বেচ্ছায় বিশ্বের সঙ্গে যোগ না দিই যদি, তাহলেই বিশ্ব আমার প্রতি জবরদস্তি করে আমাকে তার অনুগত করবে—তখন আমার আনন্দ থাকবে না, গৌরব থাক্‌বে না—তখন দাসের মত সংসারের কানমলা খাব।

অতএব একদিন এ কথা যেন সংসার না

বল্‌তে পারে যে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেব, আমিই যেন বল্‌তে পারি আমি ত্যাগ করব। কিন্তু প্রতিদিনই যদি ইচ্ছাকে এই ত্যাগের অভিমুখে প্রস্তুত না করি তবে মৃত্যু ও ক্ষতি যখন তার বড় বড় দাবি নিয়ে আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াবে তখন তাকে কোনো মতে ফাঁকি দিতে ইচ্ছা হবে অথচ সেখানে একেবারেই ফাঁকি চল্‌বে না—সে বড় দুঃখের দিন উপস্থিত হবে।

এই ত্যাগের দ্বারা আমরা দারিদ্র্য ও রিক্ততা লাভ করি এমন কথা যেন আমাদের মনে না হয়। পূর্ণতররূপে লাভ করবার জন্যেই আমাদের ত্যাগ।

আমরা যেটা থেকে বেরিয়ে না আস্‌ব সেটাকে আমরা পাব না। গর্ভের মধ্যে আবৃত শিশু তার মাকে পায় না—সে যখন নাড়ির বন্ধন কাটিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, স্বাধীন হয়, তখনি সে তার মাকে পূর্ণতরভাবে পায়।

এই জগতের গর্ভাবরণের মধ্যে থেকে আমাদের সেই রকম করে মুক্ত হতে হবে—তাহলেই যথার্থ ভাবে আমরা জগৎকে পাব—কারণ, স্বাধীন ভাবে পাব। আমরা জগতের মধ্যে বদ্ধ হয়ে ভ্রূণের মত জগৎকে দেখ্‌তেই পাইনে—যিনি মুক্ত হয়েছেন, তিনিই জগৎকে জানেন, জগৎকে পান।

এই জন্যই বলছি যে লোক সংসারের ভিতরে জড়িয়ে রয়েছে সেই যে আসল সংসারী তা নয়—যে সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই সংসারী—কারণ, সে তখন সংসারের থাকে না সংসার তারই হয়। সেই সত্য করে বল্‌তে পারে আমার সংসার।

ঘোড়া গাড়ির সঙ্গে লাগামে বদ্ধ হয়ে গাড়ি চালায়—কিন্তু ঘোড়া কি বল্‌তে পারে গাড়িটা আমার? বস্তুত গাড়ির চাকার সঙ্গে তার বেশি তফাৎ কি? যে সারথি মুক্ত থেকে গাড়ি চালায় গাড়ির উপরে কর্তৃত্ব তারই।

যদি কর্ত্তা হতে চাই তবে মুক্ত হতে হবে। এই জন্য গীতা সেই যোগকেই কর্ম্মযোগ বলেচেন যে যোগে আমরা অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করি। অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করলেই কর্ম্মের উপর আমার পূর্ণ অধিকার জন্মে—নইলে কর্ম্মের সঙ্গে জড়ীভূত হয়ে আমরা কর্ম্মেরই অঙ্গীভূত হয়ে পড়ি, আমরা কর্ম্মী হইনে।

অতএব সংসারকে লাভ করতে হলে আমাদের সংসারের বাইরে যেতে হবে, এবং কর্ম্মকে সাধন করতে গেলে আসক্তি পরিহার করে আমাদের কর্ম্ম করতে হবে।

তার মানেই হল এই যে, সংসারে নেওয়া এবং দেওয়া এই যে দুটো বিপরীত ধর্ম্ম আছে এই দুই বিপরীতের সামঞ্জস্য করতে হবে—এর মধ্যে একটা একান্ত হয়ে উঠ্‌লেই তাতে অকল্যাণ ঘটে। যদি নেওয়াটাই একমাত্র বড় হয় তাহলে আমরা আবদ্ধ হই, আর যদি

দেওয়াটাই একমাত্র বড় হয় তাহলে আমরা বঞ্চিত হই। যদি কর্ম্মটা মুক্তি-বিবর্জ্জিত হয় তাহলে আমরা দাস হই আর যদি মুক্তি কর্ম্মবিহীন হয় তাহলে আমরা বিলুপ্ত হই।

বস্তুত ত্যাগ জিনিষটা শূন্যতা নয়, তা অধিকারের পূর্ণতা। নাবালক যখন সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকারী না হয় তখন সে দান বিক্রয় করতে পারে না—তখন তার কেবল ভোগের ক্ষুদ্র অধিকার থাকে ত্যাগের মহৎ অধিকার থাকে না। আমরা যে অবস্থায় কেবল জমাতে পারি কিন্তু প্রাণ ধরে দিতে পারিনে সে অবস্থায় আমাদের সেই সঞ্চিত সামগ্রীর সম্বন্ধে আমাদের স্বাধীনতা থাকে না।

এই জন্যে খৃষ্ট বলে গিয়েছেন, যে লোক ধনী তার পক্ষে মুক্তি বড় কঠিন। কেননা যেটুকু ধন সে ছাড়তে না পারে সেইটুকু

ধনই যে তাকে বাঁধে—এই বন্ধটাকে যে যতই বড় করে তুলেছে সে যে ততই বিপদে পড়েছে।

এই সমস্ত বন্ধন প্রত্যহ শিথিল হয়ে আস্‌চে প্রত্যহ ত্যাগ আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে আস্‌চে আমাদের উপাসনা থেকে এই ফলটি যেন লাভ করি। নানা আসক্তির নিবিড় আকর্ষণে আমাদের প্রকৃতি একেবারে পাথরের মত আঁট হয়ে আছে। উপাসনার সময় অমৃতের ঝরণা ঝরতে থাক্‌—আমাদের অণুপরমাণুর ছিদ্রের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করতে থাক্‌—এই পাষাণটাকে দিনে দিনে বিশ্লিষ্ট করতে থাক্‌, আর্দ্র করতে থাক্‌, তার পরে ক্রমে এটা ক্ষইয়ে দিয়ে সরিয়ে দিয়ে জীবনের মাঝখানে একটি বৃহৎ অবকাশ রচনা করে সেই অবকাশটিকে পূর্ণ করে দিক্‌। দেখ, একবার ভিতরের দিকে চেয়ে দেখ—অন্তরের সঙ্কোচনগুলি তাঁর নামের আঘাতে প্রতিদিন

প্রসারিত হয়ে আস্‌চে, সমস্ত প্রসন্ন হচ্চে, শান্ত হচ্চে; কর্ম্ম সহজ হচ্চে, সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য ও সরল হচ্চে, এবং ঈশ্বরের মহিমা এই মানব জীবনের মধ্যে ধন্য হয়ে উঠ্‌চে।

২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ত্যাগের ফল

কিন্তু ত্যাগ কেন করব এ প্রশ্নটার চরম উত্তরটি এখনো মনের মধ্যে এসে পৌঁছল না। শাস্ত্রে উত্তর দেয় ত্যাগ না করলে স্বাধীন হওয়া যায় না, যেটিকে ত্যাগ না করব সেইটিই আমাদের বদ্ধ করে রাখবে—ত্যাগের দ্বারা আমরা মুক্ত হব।

মুক্তিলাভ করব এ কথাটার জোর যে আমাদের কাছে নেই। আমরা ত মুক্তি চাচ্চিনে; আমাদের ভিতরে যে অধীনতার একটা বিষম ঝোঁক আছে—আমরা যে ইচ্ছা করে খুসি হয়ে সংসারের অধীন হয়েছি—আমরা ঘটিবাটি থালার অধীন, আমরা ভৃত্যেরও অধীন, আমরা কথার অধীন, প্রথার অধীন, অসংখ্য প্রবৃত্তির অধীন—এতবড় জন্ম-অধীন দাসানুদাসকে এ কথা বলাই মিথ্যা যে,

মুক্তিতে তোমার সার্থকতা আছে; যে ব্যক্তি স্বভাবত এবং স্বেচ্ছাক্রমেই বদ্ধ তাকে মুক্তির প্রলোভন দেখানো মিথ্যা।

বস্তুত মুক্তি তার কাছে শূন্যতা, নির্ব্বাণ, মরুভূমি। যে মুক্তির মধ্যে তার ঘর দুয়ার ঘটিবাটি টাকাকড়ি কিছুই নেই, যা কিছুকে সে একমাত্র আশ্রয় বলে জান্‌ত তার সমস্তই বিলুপ্ত—সে মুক্তি তার কাছে বিভীষিকা, বিনাশ।

আমরা যে ত্যাগ করব তা যদি শূন্যতার মধ্যেই ত্যাগ হয় তবে সে ত একেবারেই লোকসান। একটি কানাকড়িকেও সেই রকম শূন্যের মধ্যে বিসর্জ্জন দেওয়া আমাদের পক্ষে একবারে অসহ্য।

কিন্তু ত্যাগ ত শূন্যের মধ্যে নয়। যদ্‌ যদ্‌ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ—যা কিছু করবে সমস্তই ব্রহ্মে সমর্পণ করবে। তোমার সংসারকে তোমার প্রিয়জনকে তোমার সমস্ত

কিছুকেই তাঁকে নিবেদন করে দাও—এই যে ত্যাগ এ যে পরিপূর্ণতার মধ্যে বিসর্জ্জন।

পূর্ণের মধ্যে যাকে ত্যাগ করি তাকেই সত্যরূপে পূর্ণরূপে লাভ করি এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। কিন্তু এতেও কথা শেষ হয় না। কেবলমাত্র লাভের কথায় কোনো কথার সমাপ্তি হতে পারে না—লাভ করে কি হবে এ প্রশ্ন থেকে যায়। স্বাধীন হয়েই বা কি হবে, পূর্ণতা লাভ করেই বা কি হবে?

যখন কোনো ছেলেকে পয়সা দিই সে জিজ্ঞাসা করতে পারে পয়সা নিয়ে কি হবে? উত্তর যদি দিই বাজারে যাবে তাহলেও প্রশ্ন এই যে বাজারে গিয়ে কি হবে? পুতুল কিনবে। পুতুল কিনে কি হবে? খেলা করবে। খেলা করে কি হবে? তখন একটি উত্তরে সব প্রশ্নের শেষ হয়ে যায়—খুসি হবে। খুসি হয়ে কি হবে এ প্রশ্ন কেউ কখনো অন্তরের থেকে বলে না।

ইচ্ছার পূর্ণ চরিতার্থতা হয়ে যে আনন্দ ঘটে সেই আনন্দের মধ্যেই সকল প্রশ্ন সকল সন্ধান নিঃশেষিত হয়ে যায়।

কেমন করে সংগ্রহ করব যার দ্বারা ত্যাগের শক্তি জন্মাবে? আমাদের এই প্রতিদিন উপাসনার মধ্যে আমরা কিছু কিছু সংগ্রহ করচি। এই প্রাতঃকালে সেই চৈতন্যস্বরূপের সঙ্গে নিজের চৈতন্যকে নিবিড় ভাবে পরিবেষ্টিত করে দেখ্‌বার জন্যে আমাকে যে ক্ষণকালের জন্যেও সমস্ত আবরণ ত্যাগ করতে হচ্চে—অনাবৃত হয়ে সদ্যোজাত শিশুর মত তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হচ্চে—এতেই আমার দিনে দিনে কিছু কিছু করে জমে উঠ্‌বে। আনন্দের সঙ্গে আনন্দ, প্রেমের সঙ্গে প্রেমের মিলন নিশ্চয় ক্রমশই কিছু না কিছু সহজ হয়ে আস্‌চে।

কেমন করে ত্যাগ করব? সংসারের মাঝখানে থেকে অন্তত একটা মঙ্গলের

যজ্ঞ আরম্ভ করে দাও। সেই মঙ্গল-যজ্ঞের জন্য তোমার ভাণ্ডারের একটা অতি ছোট দরজাও যদি খুলে রাখ তা হলে দেখ্‌বে আজ যে অনভ্যাসের দ্বারে একটু টান দিতে গেলেই আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌চে, যার মরচে-পড়া তালায় চাবি ঘুরচে না—ক্রমেই তা খোলা অতি সহজ ব্যাপারের মত হয়ে উঠবে—একটি শুভ উপলক্ষে ত্যাগ আরম্ভ হয়ে তা ক্রমশই বিস্তৃত হতে থাক্‌বে। সংসারকে ত আমরা অহোরাত্র সমস্তই দিই, ভগবানকেও কিছু দাও—প্রতিদিন একবার অন্তত মুষ্টিভিক্ষা দাও—সেই নিস্পৃহ ভিখারী তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি হাতে হাসিমুখে প্রতিদিনই আমাদের দ্বারে আস্‌চেন এবং প্রতিদিনই ফিরে যাচ্চেন। তাঁকে যদি একমুঠো করে দান করা আমরা অভ্যাস করি তবে সেই দানই আমাদের সকলের চেয়ে বড় হয়ে উঠ্‌বে। ক্রমে সে আর আমাদের মুঠোয় ধরবে না, ক্রমে কিছুই

আর হাতে রাখতে পারব না। কিন্তু তাঁকে যেটুকু দেব সেটুকু গোপনে দিতে হবে, তাঁর জন্যে কোনো মানুষের কাছে এতটুকু খ্যাতি চাইলে চল্‌বে না। কেননা লোককে দেখিয়ে দেওয়া সেটুকু এক রকম করে দিয়ে অন্যরকম করে হরণ করা। সেই মহাভিক্ষুকে যা দিতে হবে তা অল্প হলেও নিঃশেষে দেওয়া চাই। তার হিসেব রাখ্‌লে হবে না, তার রসিদ চাইলে চল্‌বে না। দিনের মধ্যে আমাদের একটা কোনো দান যেন এইরূপ পরিপূর্ণ দান হতে পারে—সে যেন সেই পরিপূর্ণ স্বরূপের কাছে পরিপূর্ণ ত্যাগ হয় এবং সংসারের মধ্যে এইটুকু ব্যাপারে কেবল তাঁরই সঙ্গে একাকী আমার প্রত্যহ একটি গোপন সাক্ষাতের অবকাশ ঘটে।

২৮শে অগ্রহায়ণ। ১৩১৫

প্রেম

বেদমন্ত্রে আছে মৃত্যুও তাঁর ছায়া, অমৃতও তাঁর ছায়া—উভয়কেই তিনি নিজের মধ্যে এক করে রেখেচেন। যাঁর মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে আছে তিনিই হচ্চেন চরম সত্য। তিনিই বিশুদ্ধতম জ্যোতি, তিনিই নির্ম্মলতম অন্ধকার।

সংসারের সমস্ত বিপরীতের সমন্বয় যদি কোনো একটি সত্যের মধ্যে না ঘটে তবে তাকে চরম সত্য বলে মানা যায় না। তবে তার মধ্যে যেটুকু কুলোলোনা তার জন্যে আর একটা সত্যকে মান্‌তে হয়, এবং সে দুটিকে পরস্পরের বিরুদ্ধ বলেই ধরে নিতে হয়। তাহলেই অমৃতের জন্যে ঈশ্বরকে এবং মৃত্যুর জন্যে সয়তানকে মানতে হয়।

কিন্তু আমরা ব্রহ্মের কোনো সরিককে জানিনে—আমরা জানি তিনিই সত্য, খণ্ড সত্যের সমস্ত বিরোধ তাঁর মধ্যে সামঞ্জস্য লাভ করেছে; আমরা জানি তিনিই এক; খণ্ড সত্তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতা তাঁর মধ্যে সম্মিলিত হয়ে আছে।

কিন্তু এ ত হল তত্ত্ব কথা। তিনি সত্য একথা জান্‌লে কেবল জ্ঞানে জানা হয়—এর সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগ কোথায়? এই সত্যের কি কোনো রসই নেই?

তা বল্লে চল্‌বে কি করে? সমস্ত সত্য যেমন তাঁতে মিলেছে তেম্‌নি সমস্ত রসও যে তাঁতে মিলে গেছে। সেইজন্যে উপনিষৎ তাঁকে শুধু সত্য বলেন নি, তাঁকে রসস্বরূপ বলেচেন—তাঁকে সেই পরিপূর্ণ রসরূপে জান্‌লে জানার সার্থকতা হয়।

তাহলে দাঁড়ায় এই যিনি চরম সত্য তিনিই পরম রস। অর্থাৎ তিনি প্রেমস্বরূপ। নইলে

তাঁর মধ্যে কিছুরই সমাধান হতে পারতই না—ভেদ ভেদই থাকৃত, বিরোধ কেবলই আঘাত করত এবং মৃত্যু কেবলি হরণ করে নিত। তাঁর মধ্যে যে সমস্তই মেলে—সেটা একটা জ্ঞানতত্ত্বের মিলন নয়—তাঁর মধ্যে একটি প্রেমতত্ত্ব আছে—সেই জন্য সমস্তকে মিল্‌তেই হয়—সেই জন্যই বিচ্ছেদ বিরোধ কখনই চিরন্তন সত্য বস্তু হয়ে উঠ্‌তে পারে না।

ইচ্ছার শেষ চরিতার্থতা প্রেমে। প্রেমে—কেন, কি হবে, এ সমস্ত প্রশ্ন থাকৃতেই পারে না—প্রেম আপনিই আপনার জবাবদিহি, আপনিই আপনার লক্ষ্য।

যদি বল ত্যাগের দ্বারা ত্যক্তবস্তু থেকে মুক্তিলাভ করবে তাতে আমাদের মন সায় দেয় না, যদি বল ত্যাগের দ্বারা ত্যক্ত বস্তুকে পূর্ণতর-রূপে লাভ কর্ব্বে তাহলেও আমাদের মনের সম্পূর্ণরূপে সাড়া পাওয়া যায় না। যদি বল ত্যাগের দ্বারা প্রেমকে পাওয়া যাবে, তাহলে মন

আর কথাটি কইতে পারে না—এ কথাটাকে যদি সে ঠিকমত অবধান করে শোনে তবে তাকে বলে উঠতেই হবে "তাহলে যে বাঁচি।"

ত্যাগের সঙ্গে প্রেমের ভারি একটা সম্বন্ধ আছে—এমন সম্বন্ধ যে, কে আগে কে পরে তা ঠিক করাই দায়। প্রেম ছাড়া ত্যাগ হয় না, আবার ত্যাগ ছাড়া প্রেম হতে পারে না। যা আমাদের কাছ থেকে প্রয়োজনের তাগিদে বা অত্যাচারের তাড়নায় ছিনিয়ে নেওয়া হয় সে ত ত্যাগই নয়—আমরা প্রেমে যা দিই তাই সম্পূর্ণ দিই, কিছুই তার আর রাখিনে, সেই দেওয়াতেই দানকে সার্থক মনে করি। কিন্তু এই যে প্রেম এও ত্যাগের সাধনাতেই শেষে আমাদের কাছে ধরা দেয়। যে লোক চির-কাল কেবল আপনার দিকেই টানে, নিজের অহঙ্কারকেই জয়ী করবার জন্যে ব্যস্ত সেই স্বার্থপর সেই দাম্ভিক ব্যক্তির মনে প্রেমের

উদয় হয় না—প্রেমের সূর্য একবারে কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

স্বার্থের বন্ধন ছাড়তে হবে, অহঙ্কারের নাগপাশ মোচন করতে হবে, যা কেবল জমাবার জন্যেই জীবনপাত করেছি প্রত্যহ তা ত্যাগ করতে বসতে হবে—ত্যাগটা যেন ক্রমশই সহজ হয়ে আসে, নিজের দিকের টানটা যেন প্রত্যহই আল্‌গা হয়ে আসে। তা হলেই কি যাকে মুক্তি বলে তাই পাব? হাঁ মুক্তি পাবে। মুক্তি পেয়ে কি পাব? মুক্তির যা চরম লক্ষ্য সেই প্রেমকে পাব।

প্রেম কে? তিনিই প্রেম যিনি কোনো প্রয়োজন নেই তবু আমাদের জন্য সমস্তই ত্যাগ করচেন, তিনিই প্রেমস্বরূপ। তিনি নিজের শক্তিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়ে নিয়ত আমাদের জন্য উৎসর্জ্জন করচেন—সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কৃত উৎসর্গ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দ থেকেই এই যা কিছু সমস্ত সৃষ্টি

হচ্ছে, দায়ে পড়ে কিছুই হচ্ছে না—সেই স্বয়ম্ভু সেই স্বতউৎসারিত প্রেমই সমস্ত সৃষ্টির মূল।

এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ যোগ হলেই আমাদের সমুদয় ইচ্ছার পরিপূর্ণ চরিতার্থতা হবে। সম্পূর্ণ যোগ হতে গেলেই যার সঙ্গে যোগ হবে তার মতন হতে হবে। প্রেমের সঙ্গে প্রেমের দ্বারাই যোগ হবে।

কিন্তু প্রেম যে মুক্ত, সে যে স্বাধীন। দাসত্বের সঙ্গে প্রেমের আর কোনো তফাৎই নেই—কেবল দাসত্ব বদ্ধ আর প্রেম মুক্ত। প্রেম নিজের নিয়মেই নিজে চূড়ান্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত, সে নিজের চেয়ে উপরের আর কারো কাছে কোনো বিষয়ে কোনো কৈফিয়ৎ দেয় না।

সুতরাং প্রেমস্বরূপের সঙ্গে মিলতে গেলে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে। স্বাধীন ছাড়া স্বাধীনের সঙ্গে আদান প্রদান চল্‌তে পারে না। তাঁর সঙ্গে আমাদের এই কথাবার্তা

হয়ে গেছে, তিনি আমাদের বলে রেখেছেন তুমি মুক্ত হয়ে আমার কাছে এস—যে ব্যক্তি দাস তার জন্য আমার আম দরবার খোলা আছে বটে কিন্তু সে আমার খাস দরবারে প্রবেশ করতে পারবে না।

এক এক সময় মনের আগ্রহে আমরা তাঁর সেই খাস দরবারের দরজার কাছে ছুটে যাই—কিন্তু দ্বারী বারবার আমাদের ফিরিয়ে দেয়। বলে তোমার নিমন্ত্রণ-পত্র কই। খুঁজ্‌তে গিয়ে দেখি আমার কাছে যে কটা নিমন্ত্রণ আছে সে ধনের নিমন্ত্রণ, যশের নিমন্ত্রণ, অমৃতের নিমন্ত্রণ নয়। বারবার ফিরে আসতে হল—বারবার!

টিকিট-পরীক্ষককে ফাঁকি দেবার জো নেই। আমরা দাম দিয়ে যে ইষ্টেশনের টিকিট কিনেছি সেই ইষ্টেশনেই আমাদের নাম্‌তে হবে। আমরা বহুকালের সাধনা এবং বহুদুঃখের সঞ্চয় দিয়ে এই সংসার লাইনেরই নানা গম্যস্থানের

টিকিট কিনেছি অন্য লাইনে তা চল্‌বে না। এবার থেকে প্রতিদিন আবার অন্য লাইনের টাকা সংগ্রহ করতে হবে। এবার থেকে যা কিছু সংগ্রহ এবং যা কিছু ত্যাগ করতে হবে সে কেবল সেই প্রেমের জন্যে।

সামঞ্জস্য

আমরা আর কোনো চরম কথা জানি বা না জানি নিজের ভিতব থেকে একটি চরম কথা বুঝে নিয়েছি সেটি হচ্চে এই যে, একমাত্র প্রেমের মধ্যেই সমস্ত দ্বন্দ্ব এক সঙ্গে মিলে থাকৃতে পারে। যুক্তিতে তারা কাটাকাটি করে, কর্ম্মেতে তারা মারামারি করে, কিছুতেই তারা মিল্‌তে চায় না, প্রেমেতে সমস্তই মিট্‌মাট্‌ হয়ে যায়। তর্কক্ষেত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে যারা দিতিপুত্র ও অদিতিপুত্রের মত পরস্পরকে একেবারে বিনাশ করবাব জন্যেই সর্ব্বদা উদ্যত, প্রেমের মধ্যে তারা আপন ভাই।

তর্কের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত পবস্পরের একান্ত বিরোধী ;—হাঁ যেমন না-কে কাটে, না যেমন হাঁ-কে কাটে তারা তেমনি বিরোধী। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং

অদ্বৈত ঠিক একই স্থান জুড়ে রয়েছে। প্রেমেতে একই কালে দুই হওয়াও চাই এক হওয়াও চাই। এই দুই প্রকাণ্ড বিরোধের কোনোটাই বাদ দিলে চলে না—আবার তাদের বিরুদ্ধরূপে থাক্‌লেও চল্‌বে না। যা বিরুদ্ধ তাকে অবিরুদ্ধ হয়ে থাকৃতে হবে এই এক সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড এ কেবল প্রেমেতেই ঘটে। এইজন্যই কেন যে আমি অন্যের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে যাই নিজের ভিতরকার এই রহস্য তলিয়ে বুঝতে পারিনে—কিন্তু স্বার্থ জিনিষটা বোঝা কিছুই শক্ত নয়।

ভগবান প্রেমস্বরূপ কিনা তাই তিনি এককে নিয়ে দুই করেচেন আবার দুইকে নিয়ে এক করেচেন। স্পষ্টই যে দেখতে পাচ্চি দুই যেমন সত্য, একও তেমনি সত্য। এই অদ্ভুত ব্যাপারটাকেও ত যুক্তির দ্বারা নাগাল পাওয়া যাবে না—এযে প্রেমের কাণ্ড।

উপনিষদে ঈশ্বরের সম্বন্ধে এইজন্যে কেবলি

বিরুদ্ধ কথাই দেখতে পাই। য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি। তিনি এক, এবং তাঁর কোনো বর্ণ নেই অথচ বহুশক্তি নিয়ে সেই জাতিহীন এক, অনেক জাতির গভীব প্রয়োজনসকল বিধান করচেন। যিনি এক তিনি আবার কোথা থেকে অনেকের প্রয়োজন সকল বিধান করতে যান? তিনি যে প্রেমস্বরূপ—তাই, শুধু এক হয়ে তাঁর চলে না, অনেকের বিধান নিয়েই তিনি থাকেন।

স পর্য্যগাৎ শুক্রং আবার তিনিই ব্যদধাৎ-শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—অর্থাৎ অনন্তদেশে তিনি শুদ্ধ হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, আবাব অনন্তকালে তিনি বিধান করচেন, তিনি কাজ করচেন। একাধাবে স্থিতিও তিনি গতিও তিনি।

আমাদের প্রকৃতির মধ্যেও এই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য আমরা একটিমাত্র জায়গায়

দেখতে পাই। সে হচ্ছে প্রেমে। এই চঞ্চল সংসারের মধ্যে যেখানে আমাদের প্রেম কেবলমাত্র সেই খানেই আমাদের চিত্তের স্থিতি—আর সমস্তকে আমরা ছুঁই আর চলে যাই, ধরি আর ছেড়ে দিই, যেখানে প্রেম সেইখানেই আমাদের মন স্থির হয়। অথচ সেইখানেই তার ক্রিয়াও বেশি। সেই-খানেই আমাদের মন সকলের চেয়ে সচল। প্রেমেতেই যেখানে স্থির করায় সেইখানেই অস্থির করে। প্রেমের মধ্যেই স্থিতিগতি এক নাম নিয়ে আছে।

কর্ম্মক্ষেত্রে ত্যাগ এবং লাভ ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত—তারা বিপরীতপর্য্যায়ের। প্রেমেতে ত্যাগও যা লাভও তাই। যাকে ভালবাসি তাকে যা দিই সেই দেওয়াটাই লাভ। আনন্দের হিসাবের খাতায় জমা খরচ একই জায়গায়—সেখানে দেওয়াও যা পাওয়াও তাই। ভগবানও সৃষ্টিতে এই যে আনন্দের যজ্ঞ

এই যে প্রেমের খেলা ফেঁদেছেন এতে তিনি নিজেকে দিয়ে নিজেকেই লাভ করচেন। এই দেওয়াপাওয়াকে একেবারে এক করে দেওয়াকেই বলে প্রেম।

দর্শনশাস্ত্রে মস্ত একটা তর্ক আছে ঈশ্বর পুরুষ কি অপুরুষ তিনি সগুণ কি নির্গুণ, তিনি personal কি impersonal? প্রেমের মধ্যে এই হাঁ না একসঙ্গে মিলে আছে। প্রেমের একটা কোটি সগুণ, আর একটা কোটি নির্গুণ। তার একদিক বলে আমি আছি আর একদিক বলে আমি নেই। "আমি" না হলেও প্রেম নেই, "আমি" না ছাড়লেও প্রেম নেই। সেই জন্যে ভগবান সগুণ কি নির্গুণ সে সমস্ত তর্কের কথা কেবল তর্কের ক্ষেত্রেই চলে—সে তর্ক তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না।

পাশ্চাত্য ধর্ম্মতত্ত্বে বলে আমাদের অনন্ত উন্নতি—আমরা ক্রমাগতই তাঁর দিকে যাই কোনো কালে তাঁর কাছে যাইনে। আমাদের

উপনিষৎ বলেচেন আমরা তাঁর কাছে যেতেও পারিনে আবার তাঁর কাছে যেতেও পারি—তাঁকে পাইও না, তাঁকে পাইও। যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসাসহ—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন। এমন অদ্ভুত বিরুদ্ধ কথা একই শ্লোকের দুই চরণের মধ্যে ত এমন সুস্পষ্ট করে আর কোথাও শোনা যায়নি। শুধু বাক্য ফেরে না মনও তাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে—এ একেবারে সাফ জবাব। অথচ সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জেনেছেন তিনি আর কিছু থেকে ভয় পান না। তবেইত যাঁকে একেবারেই জানা যায় না তাঁকে এমনি জানা যায় যে আর কিছু থেকেই ভয় থাকে না। সেই জানাটা কিসের জানা? আনন্দের জানা। প্রেমের জানা। এ হচ্চে সমস্ত না জানাকে লঙ্ঘন করে জানা। প্রেমের মধ্যেই না জানার সঙ্গে জানার ঐকান্তিক বিরোধ নেই। স্ত্রী তার স্বামীকে

জ্ঞানের পরিচয়ে সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ না জান্‌তে পাবে কিন্তু প্রেমেব জানায় আনন্দের জানায় এমন. করে জানতে পারে যে, কোনো জ্ঞানী তেমন করে জান্‌তে পারে না। প্রেমের ভিতবকার এই এক অদ্ভুত বহস্য যে, যেখানে একদিকে কিছুই জানিনে সেখানে অন্যদিকে সম্পূর্ণ জানি। প্রেমেতেই অসীম সীমার মধ্যে ধরা দিচ্চেন এবং সীমা অসীমকে আলিঙ্গন করচে—তর্কের দ্বারা এর কোনো মীমাংসা করবার জো নেই।

ধর্ম্মশাস্ত্রে ত দেখা যায় মুক্তি এবং বন্ধনে এমন বিরুদ্ধ সম্বন্ধ যে, কেউ কাউকে রেয়াৎ করে না। বন্ধনকে নিঃশেষে নিকাস করে দিয়ে মুক্তিলাভ করতে হবে এই আমাদের প্রতি উপদেশ। স্বাধীনতা জিনিষটা যেন একটা চূড়ান্ত জিনিষ পাশ্চাত্য শাস্ত্রেও এই সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছে। কিন্তু একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে অধীনতা

এবং স্বাধীনতা ঠিক সমান গৌরব ভোগ করে একথা আমাদের ভুল্‌লে চলবে না। সে হচ্চে প্রেমে। সেখানে অধীনতা স্বাধীনতার কাছে এক চুলও মাথা হেঁট করে না। প্রেমই সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং প্রেমই সম্পূর্ণ অধীন।

ঈশ্বর ত কেবলমাত্র মুক্ত নন তাহলে ত তিনি একেবারে নিষ্ক্রিয় হতেন। তিনি নিজেকে বেঁধেছেন। না যদি বাঁধ্‌তেন তা হলে সৃষ্টিই হতনা এবং সৃষ্টির মধ্যে কোনো নিয়ম কোনো তাৎপর্য্যই দেখা যেত না। তাঁর যে আনন্দরূপ, যেরূপে তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন এই ত তাঁর বন্ধনের রূপ। এই বন্ধনেই তিনি আমাদের কাছে আপন, আমাদের কাছে সুন্দর। এই বন্ধন তাঁর আমাদের সঙ্গে প্রণয়বন্ধন। এই তাঁর নিজকৃত স্বাধীন বন্ধনেইত তিনি আমাদের সখা, আমাদের পিতা। এই বন্ধনে যদি তিনি ধরা না দিতেন

তাহলে আমরা বল্‌তে পারতুম না যে, স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা, তিনিই বন্ধু তিনিই পিতা তিনিই বিধাতা। এত বড় একটা আশ্চর্য্য কথা মানুষের মুখ দিয়ে বের হতেই পারত না। কোন্‌টা বড় কথা? ঈশ্বর শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত, এইটে? না, তিনি আমাদের সঙ্গে পিতৃত্বে, সখিত্বে, পতিত্বে, বদ্ধ—এইটে? দুটোই সমান বড় কথা। অধীনতাকে অত্যন্ত ছোট করে দেখে তার সম্বন্ধে আমাদের একটা হীন সংস্কার হয়ে গেছে। এ রকম অন্ধ সংস্কার আরও আমাদের অনেক আছে। যেমন আমরা ছোটকে মনে করি তুচ্ছ, বড়কেই মনে করি মহৎ—যেন গণিতশাস্ত্রের দ্বারা কাউকে মহত্ত্ব দিতে পারে! তেমনি সীমাকে আমরা গাল দিয়ে থাকি। যেন, সীমা জিনিষটা যে কি তা আমরা কিছুই জানি! সীমা একটি পরমাশ্চর্য্য রহস্য। এই সীমাইত অসীমকে প্রকাশ করচে! এ কি

অনির্ব্বচনীয়! এর কি আশ্চর্য্যরূপ, কি আশ্চর্য্যগুণ, কি আশ্চর্য্যবিকাশ! একরূপ হতে আর একরূপ, একগুণ হতে আর এক-গুণ, এক শক্তি হতে আর এক শক্তি—এরইবা নাশ কোথায়! এরইবা সীমা কোন্ খানে! সীমা যে ধারণাতীত বৈচিত্র্যে, যে অগণনীয় বহুলত্বে, যে অশেষ পরিবর্ত্তন পরম্পরায় প্রকাশ পাচ্চে তাকে অবজ্ঞা করতে পারে এত বড় সাধ্য আছে কার! বস্তুত আমরা নিজের ভাষাকেই নিজে অবজ্ঞা করি কিন্তু সীমা পদার্থকে অবজ্ঞা করি এমন অধিকার আমাদের নেই। অসীমের অপেক্ষা সীমা কোনো অংশেই কম আশ্চর্য্য নয়, অব্যক্তের অপেক্ষা ব্যক্ত কোনোমতেই অশ্রদ্ধেয় নয়।

স্বাধীনতা অধীনতা নিয়েও আমরা কথার খেলা করি। অধীনতাও যে স্বাধীনতার সঙ্গেই এক আসনে বসে রাজত্ব করে একথা আমরা ভুলে যাই। স্বাধীনতাই যে আমরা চাই

তা নয়, অধীনতাও আমরা চাই। যে চাওয়াতে আমাদের ভিতরকার এই দুই চাওয়ারই সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয় সেই হচ্চে প্রেমের চাওয়া। বন্ধনকে স্বীকার করে বন্ধনকে অতিক্রম করব এই হচ্চে প্রেমের কাজ। প্রেম যেমন স্বাধীন এমন স্বাধীন আর দ্বিতীয় কেউ নেই আবার প্রেমের যে অধীনতা এত বড় অধীনতাই বা জগতে কোথায় আছে!

অধীনতা জিনিষটা যে কত বড় মহিমান্বিত বৈষ্ণবধর্ম্মে সেইটে আমাদের দেখিয়েছে। অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে অসঙ্কোচে বলেছে ভগবান জীবের কাছে নিজেকে বাঁধা রেখেচেন—সেই পরম গৌরবের উপরেই জীবের অস্তিত্ব। আমাদের পরম অভিমান এই যে তিনি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারেন নি—এই বন্ধনটি তিনি মেনেচেন—নইলে আমরা আছি কি করে?

মা যেমন সন্তানের, প্রণয়ী যেমন প্রণয়ীর

সেবা করে তিনি তেমনি বিশ্ব জুড়ে আমাদের সেবা করচেন। তিনি নিজে সেবক হয়ে সেবা জিনিষকে অসীম মাহাত্ম্য দিয়েছেন। তাঁর প্রকাণ্ড জগৎটি নিয়ে তিনি ত খুব ধুমধাম করতে পারতেন কিন্তু আমাদের মন ভোলাবার এত চেষ্টা কেন? ' নানা ছলে নানা কলায় বিশ্বের সঙ্গে আমাদের এত অসংখ্য ভাল লাগাবার সম্পর্ক পাতিয়ে দিচ্চেন কেন? এই ভাল লাগাবার অপ্রয়োজনীয় আয়োজনের কি অন্ত আছে? তিনি নানা দিক থেকে কেবলি বল্‌চেন তোমাকে আমার আনন্দ দিচ্চি তোমার আনন্দ আমাকে দাও। তিনি যে নিজেকে চারিদিকেই সীমার অপরূপ ছন্দে বেঁধেছেন—নইলে প্রেমের গীতিকাব্য প্রকাশ হয় না যে!

এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের প্রেম যেখানেই ভাল করে না মিল্‌চে সেইখানে সমস্ত জগতে তার বেসুরটা বাজ্‌চে। সেইখানে

কত দুঃখ যে জাগ্‌চে তার সীমা নেই—চোখের জল বয়ে যাচ্চে। ওগো প্রেমিক, তুমি যে প্রেম কেড়ে নেবে না তুমি যে মন ভুলিয়ে নেবে—একদিন সমস্ত মনে প্রাণে কাঁদিয়ে তার পরে তোমার প্রেমের ঋণ শোধ করাবে। তাই এত বিলম্ব হয়ে যাচ্চে—তাই ত, সন্ধ্যা হয়ে আসে তবু আমার অভিসারের সজ্জা হল না।

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৫।

—

কি চাই ?

আমরা এতদিন প্রত্যহ আমাদের উপাসনা থেকে কি ফল চেয়েছিলুম ? আমরা চেয়েছিলুম শান্তি। ভেবেছিলুম এই উপাসনা বনস্পতির মত আমাদের ছায়া দেবে, প্রতিদিন সংসারের তাপ থেকে আমাদের বাঁচাবে।

কিন্তু শান্তিকে চাইলে শান্তি পাওয়া যায় না। তার চেয়ে আরো অনেক বেশি না চাইলে শান্তির প্রার্থনাও বিফল হয়।

জ্বরের রোগী কাতর হয়ে বলে আমার এই জ্বালাটা জুড়োক্; হয়ত জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। তাতে যেটুকু শান্তি হয় সেটা ত স্থায়ী হয় না—এমন কি, তাতে তাপ বেড়ে যেতে পারে। রোগী যদি শান্তি চায়, স্বাস্থ্য না চায় তবে সে শান্তিও পায় না স্বাস্থ্যও পায় না।

আমাদেরও শান্তিতে চল্‌বে না, প্রেম দরকার। বরঞ্চ মনে ঐ যে একটুকু শান্তি পাওয়া যায়, কিছুক্ষণের জন্যে একটা স্নিগ্ধতার আবরণ আমাদের উপর এসে পড়ে সেটাতে আমাদের ভুলায়,—আমরা মনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসি আমাদের উপাসনা সার্থক হল—কিন্তু ভিতরের দিকে সার্থকতা দেখ্‌তে পাইবেন।

কেননা, দেখ্‌তে পাই, ব্যাধি যে যায় না। সমস্ত দিন নানা ঘটনায় দেখ্‌তে পাই সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সহজ হয় নি। রোগীর সঙ্গে তার বাহিরের প্রকৃতির সম্বন্ধ যে রকম সেইরকম হয়ে আছে। বাহিরে যেখানে সামান্য ঠাণ্ডা রোগীর দেহে সেখানে অসহ্য শীত; বাহিরের স্পর্শ যেখানে অতি মৃদু রোগীর দেহে সেখানে দুঃসহ বেদনা। আমাদেরও সেই দশা, বাহিরের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের ওজন ঠিক থাকচে না। ছোট

কথা অত্যন্ত বড় করে শুন্‌চি, ছোট ব্যাপার অত্যন্ত ভারি হয়ে উঠ্‌চে।

ভার বাড়ে কখন্; না, কেন্দ্রের দিকে ভারাকর্ষণ যখন বেশি হয়। পৃথিবীতে যে হাল্কা জিনিষ আমরা সহজেই তুল্‌চি, যদি বৃহস্পতিগ্রহে যাই তবে সেখানে সেটুকুও আমাদের হাড় গুঁড়িয়ে দিতে পারে। কেননা সেখানে এই কেন্দ্রের দিকের আকর্ষণ পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি। আমরাও তাই দেখ্‌চি আমাদের নিজের কেন্দ্রের দিকের টানটা অত্যন্ত বেশি—আমাদের স্বার্থ ভিতরের দিকেই টান্‌চে, অহঙ্কার ভিতরের দিকেই টান্‌চে, এই জন্যেই সব জিনিষই অত্যন্ত ভারি হয়ে উঠ্‌চে—যা তুচ্ছ তা কেবলমাত্র আমার ঐ ভিতরের টানের জোরেই আমাকে কেবলই চাপ্‌চে—সব জিনিষই আমাকে ঠেসে ধরেচে—সব কথাই আমাকে ঠেলে দিচ্চে—ক্ষণকালের শান্তির দ্বারা এটাকে ভুলে থেকে আমাদের লাভটা কি?

এই চাপটা হাল্কা হয় কখন? প্রেমে। তখন যে ঐ টানটা বাইরের দিকে যায়। আমাদের জীবনে অনেকবার তার পরিচয় পেয়েছি। যেদিন প্রণয়ীর সঙ্গে আমাদের প্রণয় বিশেষভাবে সার্থক হয়েছে সেদিন কেবল যে আকাশের আলো উজ্জ্বলতর, বনের শ্যামলতা শ্যামলতর হয়েছে তা নয় সেদিন আমাদের সংসারের ভারাকর্ষণের টান একেবারে আল্‌গা হয়ে গেছে। অন্যদিন ভিক্ষুককে যখন একপয়সামাত্র দিই সেদিন তাকে আধুলি দিয়ে ফেলি; অর্থাৎ অন্যদিন এক পয়সার যে ভার ছিল আজ বত্রিশ পয়সার সেই ভার। অন্য দিন যে কাজে হয়রান্ হয়ে পড়তুম আজ সে কাজে ক্লান্তি নেই—হঠাৎ কাজ হাল্কা হয়ে গেছে। পয়সা সেই পয়সাই আছে, কাজ সেই কাজই আছে, কেবল তার ওজন কমে গেছে কেননা টান যে আজ আমার নিজের কেন্দ্রের দিকে নয়; প্রেমে যে আমাকে

বাইরে টান দিয়ে একেবারে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত জগতের বোঝা নামিয়ে দিয়ে গেছে।

আমাদের সাধনা যেমনই হোক্ আমাদের সংসার সেই সঙ্গে যদি হাল্কা হতে না থাকে তবে বুঝ্ব যে হল না। যদি বুঝি টাকার ওজন তেম্নি ভয়ানক আছে, উপকরণের বোঝা তেমনিই আমাকে চেপে আছে, তার মধ্যে অতি ছোট টুকুকেও ফেলে দিতে পারি এমন বল আমার নেই; যদি দেখি কাজ যত বড় তার ভার যেন তার চেয়ে অনেক বেশি তাহলে বুঝ্তে হবে প্রেম জোটেনি— আমাদের বরণসভায় বর আসেনি।

তবে আর ঐ শান্তিটুকু নিয়ে কি হবে? ওতে আমাদের আসল জিনিসটা ফাঁকি দিয়ে অল্পে সন্তুষ্ট করে রাখ্বে। প্রেমের মধ্যে শুধু শান্তি নেই তাতে অশান্তিও আছে; জোয়ারের জলের মত কেবল যে তার পূর্ণতা তা নয় তারই মত তার গতিবেগও আছে;—

সে আমাদের ভরিয়ে দিয়ে বসিয়ে রাখ্‌বে না, সে আমাদের ভাঁটার মুখের থেকে ফিরিয়ে উল্টো টানে টেনে নিয়ে যাবে—তখন এই অচল সংসারটাকে নিয়ে কেবলি গুণ-টানাটানি লগি-ঠেলাঠেলি করে মরতে হবে না—সে হুহু করে ভেসে চল্‌বে!

যতদিন সেই প্রেমের টান না ধরে ততদিন শান্তিতে কাজ নেই—ততদিন অশান্তিকে যেন অনুভব করতে পারি। ততদিন যেন বেদনাকে নিয়ে রাত্রে শুতে যাই এবং বেদনাকে নিয়ে সকাল বেলায় জেগে উঠি—চোখের জলে ভাসিয়ে দাও, স্থির থাকৃতে দিয়ো না।

প্রতিদিন প্রাতে যখন অন্ধকারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়, তখন যেন দেখতে পাই বন্ধু দাঁড়িয়ে আছ, সুখের দিন হোক্‌ দুঃখের দিন হোক্‌, বিপদের দিন হোক্‌, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, আজ আমার আর ভাবনা নেই, আমার আজ সমস্তই সহ্য হবে। যখন

প্রেম না থাকে, হে সখা, তখনই শান্তির জন্যে দরবার করি। তখন অল্প পুঁজিতে যে কোনো আঘাত সইতে পারিনে—কিন্তু যখন প্রেমের অভ্যুদয় হয় তখন যে দুঃখ যে অশান্তিতে সেই প্রেমের পরীক্ষা হবে সেই দুঃখ সেই অশান্তি-কেও মাথায় তুলে নিতে পারি। হে বন্ধু, উপাসনার সময় আমি আর শান্তি চাইব না—আমি কেবল প্রেম চাইব। প্রেম শান্তিরূপেও আসবে অশান্তিরূপেও আসবে, সুখ হয়েও আসবে দুঃখ হয়েও আসবে—সে যে-কোনো বেশেই আসুক তার মুখের দিকে চেয়ে যেন বলতে পারি তোমাকে চিনেছি, বন্ধু, তোমাকে চিনেছি।

৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৫।

প্রার্থনা।

উপনিষৎ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এ যে কেবল সুন্দর শ্যামল ছায়াময় তা নয়, এ বৃহৎ এবং এ কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্য্য পল্লবিত তা নয় এতে তপস্যার কঠোরতা ঊর্দ্ধগামী হয়ে রয়েছে। সেই অভ্রভেদী সুদৃঢ় অটলতার মধ্যে একটি মধুর ফুল ফুটে আছে—তার গন্ধে আমাদের ব্যাকুল করে তুলেছে। সেটি ঐ মৈত্রেয়ীর প্রার্থনামন্ত্রটি।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন গৃহত্যাগ করবার সময় তাঁর পত্নী দুটিকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে যেতে উদ্যত হলেন তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বল ত এসব নিয়ে কি আমি অমর হব? যাজ্ঞবল্ক্য বল্লেন, না, তা হবে না, তবে কি না উপকরণবন্তের যেমনতর জীবন

তোমার জীবন সেই রকম হবে। সংসারীরা যেমন করে তাদের ঘর দুয়ার গোরুবাছুর অশনবসন নিয়ে স্বচ্ছন্দে দিন কাটায় তোমরাও তেমনি করে দিন কাটাতে পারবে।

মৈত্রেয়ী তখন একমুহূর্তে বলে উঠ্‌লেন "যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্!" যার দ্বারা আমি অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কি করব! এ তো কঠোর জ্ঞানের কথা নয়—তিনি ত চিন্তার দ্বারা ধ্যানের দ্বারা কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য তার বিবেকলাভ করে একথা বলেন নি—তাঁর মনের মধ্যে একটি কষ্টিপাথর ছিল যার উপরে সংসারের সমস্ত উপকরণকে একবার ঘষে নিয়েই তিনি বলে উঠ্‌লেন "আমি যা চাই এতো তা নয়!"

উপনিষদে সমস্ত পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রীকণ্ঠের এই একটিমাত্র ব্যাকুল বাক্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং সে ধ্বনি বিলীন হয়ে যায়নি—সেই ধ্বনি তাঁদের

মেঘমন্দ্র শান্ত স্বরের মাঝখানে অপূর্ব্ব একটি অশ্রুপূর্ণ মাধুর্য্য জাগ্রত করে রেখেছে। মানুষের মধ্যে যে পুরুষ আছে উপনিষদে নানাদিকে নানাভাবে আমরা তারই সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম এমন সময়ে হঠাৎ একপ্রান্তে দেখা গেল মানুষের মধ্যে যে নারী রয়েছেন তিনিও সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আমাদের অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে একটি নারী রয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে আমাদের সমুদয় সঞ্চয় এনে দিই। আমরা ধন এনে বলি এই নাও। খ্যাতি এনে বলি এই তুমি জমিয়ে রাখ। আমাদের পুরুষ সমস্ত জীবন প্রাণপণ পরিশ্রম করে কতদিক থেকে কত কি যে আন্‌চে তার ঠিক নেই—স্ত্রীটিকে বল্‌চে এই নিয়ে তুমি ঘর ফাঁদ, বেশ গুছিয়ে ঘরকন্না কর, এই নিয়ে তুমি সুখে থাক। আমাদের অন্তরের তপস্বিনী এখনো স্পষ্ট করে বল্‌তে পারচে না যে, এ সবে আমার কোনো ফল

হবে না, সে মনে করচে হয়ত আমি যা চাচ্চি তা বুঝি এইই। কিন্তু তবু সব নিয়েও সব পেলুম বলে তার মন মান্‌চে না। সে ভাব্‌চে হয়ত পাওয়ার পরিমাণটা আরো বাড়াতে হবে—টাকা আরো চাই, খ্যাতি আরো দরকার, ক্ষমতা আরো না হলে চল্‌চে না। কিন্তু সেই আরোর শেষ হয় না। বস্তুত সে যে অমৃতই চায় এবং এই উপকরণগুলো যে অমৃত নয় এটা একদিন তাকে বুঝতেই হবে—একদিন একমুহূর্ত্তে সমস্ত জীবনের স্তূপাকার সঞ্চয়কে এক পাশে আবর্জ্জনার মত ঠেলে দিয়ে তাকে বলে উঠতেই হবে—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্!

কিন্তু মৈত্রেয়ী ঐ যে বলেছিলেন "আমি যাতে অমৃতা না হবো তা নিয়ে আমি কি করব" তার মানেটা কি? অমর হওয়ার মানে কি এই পার্থিব শরীরটাকে অনন্তকাল বহন করে চলা? অথবা মৃত্যুর পরেও কোনোরূপে

জন্মান্তরে বা অ্ন্যান্তরে টি'কে থাকা ? মৈত্রেয়ী যে শরীরের অমরতা চান নি এবং আত্মার নিত্যতা সম্বন্ধেও তাঁর কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না একথা নিশ্চিত। তবে তিনি কিভাবে অমৃতা হতে চেয়েছিলেন ?

তিনি এই কথা বলেছিলেন, সংসারে আমরা ত কেবলি একটার ভিতর দিয়ে আর একটাতে চলেছি—কিছুতেই ত স্থির হয়ে থাকতে পারচিনে। আমার মনের বিষয়গুলোও সরে যায় আমার মনও সরে যায়। যাকে আমার চিত্ত অবলম্বন করে তাকে যখন ছাড়ি তখন তার সম্বন্ধে আমার মৃত্যু ঘটে। এমনি করে ক্রমাগত এক মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আর মৃত্যুতে চলেছি—এই যে মৃত্যুর পর্য্যায় এর আর অন্ত নেই।

অথচ আমার মন এমন কিছুকে চায় যার থেকে তাকে আর নড়তে হবে না—যেটা পেলে সে বলতে পারে এ ছাড়া আমি আর

বেশি চাইনে—যাকে পেলে আর ছাড়া-ছাড়ির কোনো কথাই উঠ্‌বে না। তা হলেই ত মৃত্যুর হাত একেবারে এড়ানো যায়।' এমন কোন্ মানুষ এমন কোন্ উপকরণ আছে যাকে নিয়ে বল্‌তে পারি এই আমার চিরজীবনের সম্বল লাভ হয়ে গেল—আর কিছুই দরকার নেই!

সেইজন্যেই ত স্বামীর ত্যক্ত সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ঠেলে ফেলে দিয়ে মৈত্রেয়ী বলে উঠে-ছিলেন এসব নিয়ে আমি কি করব! আমি যে অমৃতকে চাই!

আচ্ছা, বেশ, উপকরণ ত অমৃত নয়, তা হলে অমৃত কি! আমরা জানি অমৃত কি। পৃথিবীতে একেবারে যে তার স্বাদ পাইনি তা নয়। যদি না পেতুম তা হলে তার জন্যে আমাদের কান্না উঠ্‌ত না। আমরা সংসারের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কেবলি তাকে খুঁজে বেড়াচ্চি, তার কারণ ক্ষণে-ক্ষণে সে আমাদের স্পর্শ করে যায়।

মৃত্যুর মধ্যে এই অমৃতের স্পর্শ আমরা কোন্‌খানে পাই? যেখানে আমাদের প্রেম আছে। এই প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছায়া ফেলে পুরাতনকে নবীন করে রাখে, মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে না। সংসারের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে এই যে প্রেমের আভাস দেখ্‌তে পেয়ে আমরা মৃত্যুর অতীত পরম পদার্থের পরিচয় পাই, তাঁর স্বরূপ যে প্রেমস্বরূপ তা বুঝ্‌তে পারি—এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাবার জন্যে আমাদের অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করি তখন আমরা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসেই ঠেলে দিয়ে বল্‌তে পারি "যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্য্যাম্‌!"

এই যে কথা, এটি যখন রমণীর মুখের থেকে উঠেছে তখন কি স্পষ্ট, কি সত্য, কি মধুর হয়েই উঠেছে। সমস্ত চিন্তা সমস্ত

যুক্তি পরিহার করে কি অনায়াসেই এটি ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। ওগো, আমি ঘর-দুয়ার কিছুই চাইনে আমি প্রেম চাই—এ কি কান্না!

মৈত্রেয়ীর সেই সরল কান্নাটি যে প্রার্থনা-রূপ ধারণ করে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তেমন আশ্চর্য্য পরিপূর্ণ প্রার্থনা কি জগতে আর কোথাও কখনো শোনা গিয়েছে? সমস্ত মানবহৃদয়ের একান্ত প্রার্থনাটি এই রমণীর ব্যাকুলকণ্ঠে চিরন্তনকালের জন্যে বাণীলাভ করেছে। এই প্রার্থনাই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র প্রার্থনা, এবং এই প্রার্থনাই বিশ্ব-মানবের বিরাট্ ইতিহাসে যুগে যুগান্তরে উচ্চারিত হয়ে আস্‌চে!

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্ এই কথাটি সবেগে বলেই কি সেই ব্রহ্মবাদিনী তখনি জোড়হাতে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর অশ্রুপ্লাবিত মুখটি আকাশের দিকে তুলে বলে উঠলেন—অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা

জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতঙ্গময়—আবিরাবীর্ম-এধি—রুদ্র যত্তে দক্ষিণংমুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্?

উপনিষদে পুরুষের কণ্ঠে আমরা অনেক গভীর উপলব্ধির কথা পেয়েছি কিন্তু কেবল স্ত্রীর কণ্ঠেই এই একটি গভীর প্রার্থনা লাভ করেছি। আমরা যথার্থ কি চাই অথচ কি নেই তার একাগ্র অনুভূতি প্রেমকাতর রমণী-হৃদয় থেকেই অতি সহজে প্রকাশ পেয়েছে। —হে সত্য, সমস্ত অসত্য হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম উপবাসী হয়ে থাকে, হে জ্যোতি, গভীর অন্ধকার হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম কারারুদ্ধ হয়ে থাকে, হে অমৃত, নিরন্তর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম আসন্নরাত্রির পথিকের মত নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। হে প্রকাশ,

তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও তাহলেই আমার সমস্ত প্রেম সার্থক হবে। আবিরাবীর্ম্ম এধি—হে আবিঃ হে প্রকাশ, তুমি ত চির-প্রকাশ, কিন্তু তুমি একবার আমার হও, আমার হয়ে প্রকাশ পাও—আমাতে তোমার প্রকাশ পূর্ণ হোক্! হে রুদ্র হে ভয়ানক—তুমি যে পাপের অন্ধকারে বিরহরূপে দুঃসহ রুদ্র, যত্তে দক্ষিণংমুখং, তোমার যে প্রসন্নসুন্দর মুখ, তোমার যে প্রেমের মুখ, তাই আমাকে দেখাও—তেন মাং পাহি নিত্যম্—তাই দেখিয়ে আমাকে রক্ষা কর, আমাকে বাঁচাও, আমাকে নিত্যকালের মত বাঁচাও—তোমার সেই প্রেমের প্রকাশ, সেই প্রসন্নতাই আমার অনন্তকালের পরিত্রাণ!

হে তপস্বিনী মৈত্রেয়ী, এস সংসারের উপকরণপীড়িতের হৃদয়ের মধ্যে তোমার পবিত্র চরণ দুটি আজ স্থাপন কর—তোমার সেই অমৃতের প্রার্থনাটি তোমার মৃত্যুহীন মধুর

প্রার্থনা

কণ্ঠে আমার হৃদয়ে উচ্চারণ করে যাও—নিত্যকাল যে কোন করে রক্ষা পেতে হবে আমার মনে তার যেন লেশমাত্র সন্দেহ না থাকে।

২রা পৌষ ১৩১৫

শান্তিনিকেতন

(দ্বিতীয়)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ।০ আনা

প্রকাশক—

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্

কার্য্যালয়—৭৩।১, সুকিয়া ষ্ট্রীট,

শাখা দোকান—২০।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কার্ত্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

সূচী

ভ্রম-সংশোধন।

শান্তিনিকেতনের প্রথম খণ্ডে দুইটি ভুল থাকিয়া গিয়াছে। পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া সেই দুই স্থল সংশোধন করিয়া লইবেন।

২২ পৃষ্ঠা—শেষ লাইন—

আত্মায় গিয়ে পৌঁছলে স্থানে হইবে

আত্মায় গিয়ে না পৌঁছলে।

৭৩ পৃষ্ঠা প্রথম প্যারাগ্রাফের শেষ লাইন —পাইবেন স্থলে হইবে পাই নে।

শান্তি নিকেতন

বিকার-শঙ্কা

প্রেমের সাধনায় বিকারের আশঙ্কা আছে। প্রেমের একটা দিক্ আছে যেটা প্রধানত রসেরই দিক্—সেইটের প্রলোভনে জড়িয়ে পড়লে কেবলমাত্র সেইখানেই ঠেকে যেতে হয়—তখন কেবল রসসম্ভোগকেই আমরা সাধনার চরম সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। তখন এই নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। এই নেশাকেই দিনরাত্রি জাগিয়ে তুলে আমরা কর্ম্মের কঠোরতা, জ্ঞানের বিশুদ্ধতাকে ভুলে

থাকৃতে চাই—কর্ম্মকে বিস্মৃত হই, জ্ঞানকে অমান্য করি।

এমনি করে বস্তুত আমরা গাছকে কেটে ফেলে ফুলকে নেবার চেষ্টা করি, ফুলের সৌন্দর্য্যে যতই মুগ্ধ হইনা, গাছকে যদি তার সঙ্গে তুলনায় নিন্দিত করে, তাকে কঠোর বলে,' তাকে দুরারোহ বলে উৎপাটন করে ফুলটি তুলে নেবার চেষ্টা করি তাহলে তখনকার মত ফুলকে পাওয়া যায় কিন্তু চিরদিন সেই ফুল নূতন নূতন করে ফোট্‌বার মূল আশ্রয়কেই নষ্ট করা হয়। এমনি করে ফুলটির প্রতিই একান্ত লক্ষ্য করে তার প্রতি অবিচার এবং অত্যাচারই করে থাকি।

কাব্যের থেকে আমরা ভাবের রস গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হই। কিন্তু সেই রসের সম্পূর্ণতা নির্ভর করে কিসের উপরে? তার তিনটি আশ্রয় আছে। একটি হচ্চে কাব্যের কলেবর—ছন্দ এবং ভাষা; তা ছাড়া ভাবকে যেটির

পরে যেটিকে যেরূপে সাজালে তার প্রকাশটি সুন্দর হয় সেই বিন্যাস-নৈপুণ্য। এই কলেবর রচনার কাজ যেমন তেমন করে চলে না— কঠিন নিয়ম রক্ষা করে চল্‌তে হয়—তার একটু ব্যাঘাত হলেই যতিঃ পতন ঘটে, কানকে পীড়িত করে, ভাবের প্রকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়। অতএব এই ছন্দ, ভাষা এবং ভাববিন্যাসে কবিকে নিয়মের বন্ধন স্বীকার করতেই হয়, এতে যথেচ্ছাচার খাটে না। তার পরে আর একটা বড় আশ্রয় আছে সেটা হচ্চে জ্ঞানের আশ্রয়। সমস্ত শ্রেষ্ঠকাব্যের ভিতরে এমন একটা কিছু থাকে যাতে আমাদের জ্ঞান তৃপ্ত হয়—যাতে আমাদের মনন বৃত্তিকেও উদ্বোধিত করে তোলে। কবি যদি অত্যন্তই খামখেয়ালি এমন একটা বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেন যাতে আমাদের জ্ঞানের কোনো খাদ্য না থাকে অথবা যাতে সত্যের বিকৃতিবশত মননশক্তিকে পীড়িত করে তোলে তবে সে কাব্যে রসের

প্রকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়—সে কাব্য স্থায়ীভাবে ও গভীরভাবে আমাদের আনন্দ দিতে পারে না। তার তৃতীয় আশ্রয় এবং শেষ আশ্রয় হচ্চে ভাবের আশ্রয়—এই ভাবের সংস্পর্শে আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়ে ওঠে। অতএব শ্রেষ্ঠকাব্যে প্রথমে আমাদের কানের এবং কলাবোধের তৃপ্তি, তার পরে আমাদের বুদ্ধির তৃপ্তি ও তার পরে হৃদয়ের তৃপ্তি ঘটলে তবেই আমাদের সমগ্র প্রকৃতির তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের যে রস তাই আমাদের স্থায়ীরূপে প্রগাঢ়রূপে অন্তরকে অধিকার করে। নইলে, হয় রসের ক্ষীণতা ক্ষণিকতা, নয় রসের বিকার ঘটে।

চিনি, মধু, গুড়ের যখন বিকার ঘটে তখন সে গাঁজিয়ে ওঠে, তখন সে মোদো হয়ে ওঠে, তখন সে আপনার পাত্রটিকে ফাটিয়ে ফেলে। মানসিক রসের বিকৃতিতেও আমাদের মধ্যে প্রমত্ততা আনে, তখন আর সে বন্ধন মানে না,

অধৈর্য্য অশান্তিতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এই রসের উন্মত্ততায় আমাদের চিত্ত যখন উন্মথিত হতে থাকে তখন সেইটেকেই সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। কিন্তু নেশাকে কখনই সিদ্ধি বলা চলে না, অসতীত্বকে প্রেম বলা চলে না, জ্বর বিকারের দুর্বার উত্তেজনাকে স্বাস্থ্যের বলপ্রকাশ বলা চলে না। মত্ততার মধ্যে যে একটা উগ্র প্রবলতা আছে সেটা বস্তুত লাভ নয়—সেটাতে নিজের স্বভাবের অন্য সবদিক থেকেই হরণ করে কেবল একটি-মাত্র দিককে অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত করে তোলা হয়। তাতে যে কেবল যে-সকল অংশের থেকে হরণ করা হয় তাদেরই ক্ষতি ও কৃশতা ঘটে তা নয় যে অংশকে ফাঁপিয়ে মাতিয়ে তোলা হয় তারও ভাল হয় না। কারণ, স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন অংশ যখন সহজভাবে সক্রিয় থাকে তখনই প্রত্যেকটির যোগে প্রত্যেকটি সার্থক হয়ে থাকে—এ কটির

থেকে আর একটি যদি চুরি করে তবে যার চুরি যায় তারও ক্ষতি হয় এবং চোরও নষ্ট হতে থাকে।

তাই বল্‌ছিলুম, প্রেম যদি সত্য থেকে জ্ঞান থেকে চুরি করে মত্ত হয়ে বেড়ায়, তার সংযম ও ধৈর্য্য নষ্ট হয়, তার কল্পনাবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে তবে সে নিজের প্রতিষ্ঠাকে নিজের হাতে নষ্ট করে নিজেকে লক্ষ্মীছাড়া করে তোলে।

আমরা যে প্রেমের সাধনা করব সে সতী-স্ত্রীর সাধনা। তাতে সতীর তিন লক্ষণই থাক্‌বে—তাতে হ্রী থাক্‌বে, ধী থাক্‌বে এবং শ্রী থাক্‌বে। * তাতে সংযম থাকবে, সু-

* স্ত্রীলোকের কোন্‌ গুণগুলি শ্রেষ্ঠ তাহার উত্তরে পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রজ মহাশয় কোনো একটি খাতায় লিখিয়াছিলেন- শ্রী, হ্রী ও ধী।

বিবেচনা থাকবে, এবং সৌন্দর্য্য থাকবে। এই প্রেম সংসারের মধ্যে চলায় ফেরায়, কথায় বার্ত্তায়, কাজে কর্ম্মে, দেনায় পাওনায়, ছোটয় বড়য়, সুখে দুঃখে, ব্যাপ্তভাবে সুতরাং সংযত-ভাবে নির্ম্মলভাবে মধুরভাবে প্রকাশ পেতে থাকবে। প্রেমের যে একটি স্বাভাবিক হ্রী আছে সেই লজ্জার আবরণটুকু থাকলেই তবে সে বৃহৎভাবে পরিব্যাপ্ত হতে পারে, নইলে কোনো একটা দিকেই সে জ্বলে উঠে হয় ত কর্ম্মকে নষ্ট করে, জ্ঞানকে বিকৃত করে, সংসারকে আঘাত করে, নিজেকে একদমে খরচ করে ফেলে। হ্রী দ্বারাই সতী স্ত্রী আপনার প্রেমকে ধারণ করে, তাকে নানাদিকে বিকীর্ণ করে দেয়—এইরূপে সে প্রেম কাউকে দগ্ধ করে না, সকলকে আলোকিত করে। আমাদের পৃথিবীর এই রকমের একটি আবরণ আছে—সেটি হচ্ছে বাতাসের আবরণ। এই আবরণ-টির দ্বারাই ধরণী সূর্য্যের আলোককে

পরিমিত এবং ব্যাপকভাবে সর্ব্বত্র বিকীর্ণ করে দেয়। এই আবরণটি না থাকলে রৌদ্র যেখানটিতে পড়ত সেখানটিকে দগ্ধ এবং রুদ্ররূপে উজ্জ্বল করত এবং ঠিক তার পাশেই যেখানে ছায়া সেখানে হিমশীতল মৃত্যু ও নিবিড়তম অন্ধকার বিরাজ করত। অসতীর যে প্রেমে হ্রী নেই, সংযম নেই, সে প্রেম নিজেকে পরিমিত-ভাবে সর্ব্বত্র বিকীর্ণ করতে পারে না; সে প্রেম এক জায়গায় উগ্রজ্বালা এবং ঠিক তার পাশেই তেজোহীন আলোক-বঞ্চিত ঔদাসীন্য বিস্তার করে।

আমাদেরও এই মানস-পুরীর সতীর প্রেমে ধী থাকবে, জ্ঞানের বিশুদ্ধতা থাকবে। এ প্রেম সংস্কারজালে জড়িত মূঢ় প্রেম নয়। পশুদের মত এ একটা সংস্কারগত অন্ধ প্রেম নয়। এর দৃষ্টি জাগ্রত, এর চিত্ত উন্মুক্ত। কোনো কল্পনার দ্রব্য দিয়ে এ নিজেকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে চায় না—এ যাকে চায় তার

অবাধ পরিচয় চায়, তার সম্বন্ধে সে যে নিজের জ্ঞানকে অপমানিত করে রাখ্‌বে এ সে সহ্য করতে পারে না। এর মনে মনে কেবলি এই ভয় হয় যে পাছে পাবার একান্ত আগ্রহে একটা কোনো ভুলকে পেয়েই সে নিজেকে শান্ত করে রাখে। পাখী যেমন ডিমে তা দেবার জন্যেই ব্যাকুল, তাই সে একটা নুড়ি পেলেও তাতে তা দিতে বসে, তেমনি পাছে আমাদের প্রেম কোনো মতে কেবল আত্ম-সমর্পণ করতেই ব্যগ্র হয় কাকে যে আত্মসমর্পণ করচে সেটার দিকে পাছে তার কোনো খেয়াল না থাকে এই আশঙ্কাটুকু যায় না— পতিকে দেখে নেবার জন্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজের প্রদীপটিকে যেন সে সাবধানে জ্বালিয়ে রাখ্‌তে চায়।

তার পরে আমাদের এই সতীর প্রেমে শ্রী থাক্‌বে, সৌন্দর্য্যের আনন্দময়তা থাক্‌বে। কিন্তু যদি হ্রীর অভাব ঘটে, যদি

ধীর বিকার ঘটে, তবে এই শ্রীও নষ্ট হয়ে যায়।

সতী মৈত্রেয়ী যে প্রার্থনা উচ্চারণ করে-ছিলেন তার মধ্যেও প্রেমের কোনো অঙ্গের অভাব ছিল না। তিনি যে অমৃত চেয়ে-ছিলেন, তা পরিপূর্ণ প্রেম—তা কর্ম্মহীন জ্ঞানহীন প্রমত্ত প্রেম নয়। তিনি বলেছিলেন, অসতোমা সদ্গময়—অসত্য হতে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও! তিনি বলেছিলেন, আমি যাঁকে চাই তিনি যে সত্য, নিজেকে সকল দিকে সত্যের নিয়মে সত্যের বন্ধনে না বাঁধলে তাঁর সঙ্গে যে আমার পরিণয়বন্ধন সমাপ্ত হবে না। বাক্যে, চিন্তায়, কর্ম্মে সত্য হতে হবে, তাহলেই যিনি বিশ্বজগতে সত্য, যিনি বিশ্বসমাজে সত্য তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্মিলন সত্য হয়ে উঠবে, নইলে পদে পদে বাধ্‌তে থাক্‌বে। এ সাধনা কঠিন সাধনা, এ পুণ্যের সাধনা, এ কর্ম্মের সাধনা।

তার পরে তিনি বলেছিলেন, তমসোমা জ্যোতির্গময়। তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ—বিশ্বজগতের মধ্যে তিনি যেমন ধ্রুব সত্যরূপে আছেন, তেমনি সেই সত্যকে যে আমরা জানছি সেই জ্ঞান যে জ্ঞানস্বরূপেরই প্রকাশ। সেই জন্যই ত গায়ত্রী মন্ত্রে একদিকে ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোকের মধ্যে তাঁর সত্য প্রত্যক্ষ করবার নির্দ্দেশ আছে তেমনি অন্যদিকে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে তাঁর জ্ঞানকে উপলব্ধি করবারও উপদেশ আছে—যিনি ধীকে প্রেরণ করছেন তাঁকে জ্ঞানের মধ্যে ধীস্বরূপ বলেই জানতে হবে। বিশ্বভুবনের মধ্যে সেই সত্যের সঙ্গে মিল্‌তে হবে, জ্ঞানের মধ্যে সেই জ্ঞানের সঙ্গে মিল্‌তে হবে। ধ্যানের দ্বারা যোগের দ্বারা এই মিলন।

তার পরের প্রার্থনা মৃত্যোর্মামৃতংগময়। আমরা আমাদের প্রেমকে মৃত্যুর মধ্যে পীড়িত খণ্ডিত করচি; তোমার অনন্ত প্রেম অখণ্ড

আনন্দের মধ্যে তাকে সার্থক কর। আমাদের অন্তঃকরণের বহু-বিভক্ত রসের উৎস, হে রসস্বরূপ, তোমার পরিপূর্ণ রসসমুদ্রে মিলিত হয়ে চরিতার্থ হোক্। এম্‌নি করে অন্তরাত্মা সত্যের সংযমে, জ্ঞানের আলোকে ও আনন্দের রসে পরিপূর্ণ হয়ে, প্রকাশই যাঁর স্বরূপ তাঁকে নিজের মধ্যে লাভ করুক্ তাহ'লেই রুদ্রের যে প্রেমমুখ তাই আমাদের চিরন্তন কাল রক্ষা করবে।

৩রা পৌষ।

দেখা

এই ত দিনের পর দিন, আলোকের পর আলোক আসচে। কতকাল থেকেই আসচে, প্রত্যহই আসচে। এই আলোকের দূতটি পুষ্প-কুঞ্জে প্রতিদিন প্রাতেই একটি আশা বহন করে আনচে; যে কুঁড়িগুলির ঈষৎ একটু উদ্গম হয়েছেমাত্র তাদের বলচে, তোমরা আজ জাননা কিন্তু তোমরাও তোমাদের সমস্ত দলগুলি একেবারে মেলে দিয়ে সুগন্ধে সৌন্দর্য্যে একেবারে বিকশিত হয়ে উঠ্‌বে। এই আলোকের দূতটি শস্যক্ষেত্রের উপরে তার জ্যোতির্ম্ময় আশীর্ব্বাদ স্থাপন করে প্রতিদিন এই কথাটি বলচে, "তোমরা মনে করচ, আজ যে বায়ুতে হিল্লোলিত হয়ে তোমরা শ্যামল মাধুর্য্যে চারিদিকের চক্ষু জুড়িয়ে দিয়েছ এতেই বুঝি তোমাদের সব হয়ে গেল, কিন্তু

তা নয় একদিন তোমাদের জীবনের মাঝ-খানটি হতে একটি শীষ উঠে একেবারে স্তরে স্তরে ফসলে ভরে যাবে।" যে ফুল ফোটেনি আলোক প্রতিদিন সেই ফুলের প্রতীক্ষা নিয়ে আসচে—যে ফসল ধরেনি আলোকের বাণী সেই ফসলের নিশ্চিত আশ্বাসে পরিপূর্ণ। এই জ্যোতির্ম্ময় আশা প্রতিদিনই পুষ্পকুঞ্জকে এবং শস্যক্ষেত্রকে দেখা দিয়ে যাচ্চে।

কিন্তু এই প্রতিদিনের আলোক, এ ত কেবল ফুলের বনে এবং শস্যের ক্ষেতে আসচে না! এ যে রোজই সকালে আমাদের ঘুমের পর্দ্দা খুলে দিচ্চে। আমাদেরই কাছে এর কি কোনো কথা নেই! আমাদের কাছেও এই আলো কি প্রত্যহ এমন কোনো আশা আনচে না, যে আশার সফল মূর্ত্তি হয় ত কুঁড়িটুকুর মত নিতান্ত অন্ধভাবে আমাদের ভিতরে রয়েছে, যার শীষটি এখনো আমাদের জীবনের কেন্দ্রস্থল থেকে উর্দ্ধ আকাশের দিকে মাথা তোলে নি?

দেখা

আলো কেবল একটিমাত্র কথা প্রতিদিন আমাদের বল্‌চে—"দেখ!" বাস্‌। "একবার চেয়ে দেখ!" আর কিছুই না!

আমরা চোখ মেলি, আমরা দেখি। কিন্তু সেই দেখাটুকু দেখার একটু কুঁড়িমাত্র, এখনো তা অন্ধ। সেই দেখায় দেখার সমস্ত ফসল ধরবার মত স্বর্গাভিগামী শীষ্‌টি এখনো ধরে নি। বিকশিত দেখা এখনো হয় নি, ভবপুর দেখা এখনো দেখি নি!

কিন্তু তবু রোজ সকাল বেলায় বহুযোজন দূর থেকে আলো এসে বল্‌চে—দেখ! সেই যে একই মন্ত্র রোজই আমাদের কানে উচ্চারণ করে যাচ্চে তার মধ্যে একটি অশ্রান্ত আশ্বাস প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েচে—আমাদের এই দেখার ভিতরে এমন একটি দেখার অঙ্কুর রয়েছে যার পূর্ণ পরিণতির উপলব্ধি এখনো আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠে নি!

কিন্তু একথা মনে কোরো না আমার এই

কথাগুলি অলঙ্কারমাত্র। মনে কোরো না, আমি রূপকে কথা কচ্চি। আমি জ্ঞানের কথা, ধ্যানের কথা কিছু বলচি নে, আমি নিতান্তই সরলভাবে চোখে দেখার কথাই বলচি।

আলোক যে দেখাটা দেখায় সে ত ছোট-খাটো কিছুই নয়। শুধু আমাদের নিজের শয্যাটুকু, শুধু ঘরটুকু ত দেখায় না—দিগন্ত-বিস্তৃত আকাশমণ্ডলের নীলোজ্জ্বল থালাটির মধ্যে যে সামগ্রী সাজিয়ে সে আমাদের সম্মুখে ধরে—সে কি অদ্ভুত জিনিষ! তার মধ্যে বিস্ময়ের যে অন্ত পাওয়া যায় না! আমাদের প্রতিদিনের যেটুকু দরকার তার চেয়ে সে যে কতই বেশি!

এই যে বৃহৎ ব্যাপারটা আমরা রোজ দেখ্‌চি এই দেখাটা কি নিতান্তই একটা বাহুল্য ব্যাপার! এ কি নিতান্ত অকারণে মুক্তহস্ত ধনীর অপব্যয়ের মত আমাদের চার-দিকে কেবল নষ্ট হবার জন্যেই হয়েছে! এতবড়

দৃশ্যের মাঝখানে থেকে আমরা কিছু টাকা জমিয়ে, কিছু খ্যাতি নিয়ে, কিছু ক্ষমতা ফলিয়েই যেমনি একদিন •চোখ বুজ্‌ব অমনি এমন বিরাট্‌জগতে চোখ মেলে চাবার আশ্চর্য্য সুযোগ একেবারে চূড়ান্ত হয়ে শেষ হয়ে যাবে। এই পৃথিবীতে যে আমরা প্রতিদিন চোখ মেলে চেয়েছিলুম এবং আলোক ঐই চোখকে প্রতিদিনই অভিষিক্ত করেছিল, তার কি পুরা হিসাব ঐ টাকা এবং খ্যাতি এবং ভোগের মধ্যে পাওয়া যায়?

না, তা পাওয়া যায় না। তাই আমি বল্‌চি এই আলোক অন্ধ কুঁড়িটির কাছে প্রত্যহই যেমন একটি অভাবনীয় বিকাশের কথা বলে যাচ্চে, আমাদের দেখাকেও সে তেমনি করেই আশা দিয়ে যাচ্চে, যে, "একটি চরম দেখা একটি পরম দেখা আছে সেটি তোমার মধ্যেই আছে। সেইটি একদিন ফুটে উঠ্‌বে বলেই রোজ আমি তোমার কাছে আনাগোনা কর্‌চি।"

তুমি কি ভাব্‌চ, চোখ বুজে ধ্যানযোগে

দেখবার কথা আমি বলচি? আমি এই চর্ম্মচক্ষে দেখার কথাই বলচি। চর্ম্মচক্ষুকে চর্ম্মচক্ষু বলে গাল দিলে চল্‌বে কেন? এ'কে শারীরিক বলে তুমি ঘৃণা করবে এত বড় লোকটি তুমি কে? আমি বলচি এই চোখ দিয়েই এই চর্ম্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা—তাই যদি না থাকৃত তবে আলোক বৃথা আমাদের জাগ্রত করচে, তবে এতবড় এই গ্রহতারা-চন্দ্রসূর্য্য-খচিত প্রাণে সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ বিশ্বজগৎ বৃথা আমাদের চারিদিকে অহোরাত্র নানা আকারে আত্ম-প্রকাশ করচে! এই জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার চরম সফলতা কি বিজ্ঞান? সূর্য্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরচে—নক্ষত্রগুলি একএকটি সূর্য্যমণ্ডল, এই কথাগুলি আমরা জান্‌ব বলেই এতবড় জগতের সাম্‌নে আমাদের এই দুটি চোখের পাতা খুলে গেছে? এ জেনেই বা কি হবে!

জেনে হয় ত অনেক লাভ হতে পারে কিন্তু জানার লাভ সে ত জানারই লাভ; তাতে জ্ঞানের তহবিল পূর্ণ হচ্চে—তা হোক্। কিন্তু আমি যে বলচি চোখে দেখার কথা। আমি বলচি, এই চোখেই আমরা যা দেখ্‌তে পাব তা এখনো পাইনি। আমাদের সাম্‌নে আমাদের চারদিকে যা আছে তার কোনোটাকেই আমরা দেখ্‌তে পাইনি—ঐ তৃণটিকেও না। আমাদের মনই আমাদের চোখকে চেপে রয়েছে—সে যে কত মাথামুণ্ড ভাবনা নিয়ে আছে তার ঠিকানা নেই—সেই অশন বসনের ভাবনা দিয়ে সে আমাদের দৃষ্টিকে ঝাপ্‌সা করে রেখেছে—সে কত লোকের মুখ থেকে কত সংস্কার নিয়ে জমা করেছে—তার যে কত বাঁধা শব্দ আছে, কত বাঁধা মত আছে তার সীমা নেই, সে কাকে যে বলে শরীর কাকে যে বলে আত্মা, কাকে যে বলে হেয় কাকে যে বলে শ্রেয়, কাকে যে বলে সীমা

কাকে যে বলে অসীম তার ঠিকানা নেই—এই সমস্ত সংস্কারের দ্বারা চাপা দেওয়াতে আমাদের দৃষ্টি নির্ম্মল নির্ম্মুক্তভাবে জগতের সংস্রব লাভ করতেই পারে না।

আলোক তাই প্রত্যহই আমাদের চক্ষুকে নিদ্রালসতা থেকে ধৌত করে দিয়ে বল্‌চে তুমি স্পষ্ট করে দেখ, তুমি নির্ম্মল হয়ে দেখ, পদ্ম যে রকম সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে সূর্য্যকে দেখে তেম্‌নি করে দেখ। কাকে দেখ্‌বে? তাঁকে যাঁকে ধ্যানে দেখা যায়? না তাঁকে না, যাঁকে চোখে দেখা যায় তাঁকেই। সেই রূপের নিকেতনকে, যাঁর থেকে গণনাতীত রূপের ধারা অনন্ত কাল থেকে ঝরে পড়চে! চারিদিকেই রূপ—কেবলি একরূপ থেকে আর একরূপের খেলা; কোথাও তার আর শেষ পাওয়া যায় না—দেখেও পাইনে, ভেবেও পাইনে। রূপের ঝরণা দিকে দিকে থেকে কেবলি প্রবাহিত হয়ে সেই অনন্তরূপসাগরে গিয়ে

ঝাঁপ দিয়ে পড়চে। সেই অপরূপ অনন্ত-রূপকে তাঁর রূপের লীলার মধ্যেই যখন দেখ্‌ব তখন পৃথিবীর আলোকে একদিন আমাদের চোখ মেলা সার্থক হবে, আমাদের প্রতিদিনকার আলোকের অভিষেক চরিতার্থ হবে। আজ যা দেখ্‌চি, এই যে চারিদিকে আমার যে-কেউ আছে যা-কিছু আছে এদের একদিন যে কেমন করে, কি পরিপূর্ণ চৈতন্যযোগে দেখ্‌ব তা আজ মনে করতে পারি নে—কিন্তু এটুকু জানি আমাদের এই চোখের দেখার সামনে সমস্ত জগৎকে সাজিয়ে আলোক আমাদের কাছে যে আশার বার্ত্তা আন্‌চে তা এখনো কিছুই সম্পূর্ণ হয় নি! এই গাছের রূপটি যে তাঁর আনন্দরূপ সে দেখা এখনো আমাদের দেখা হয় নি—মানুষের মুখে যে তাঁর অমৃতরূপ সে দেখার এখনো অনেক বাকি—"আনন্দরূপমমৃতং" এই কথাটি যেদিন আমার এই দুই চক্ষু বল্‌বে সেইদিনই তারা

সার্থক হবে। সেইদিনই তাঁর সেই পরম সুন্দর প্রসন্নমুখ—তাঁর দক্ষিণং মুখং একেবারে আকাশে তাকিয়ে দেখ্‌তে পাবে। তখনি সর্ব্বত্রই নমস্কারে আমাদের মাথা নত হয়ে পড়বে—তখন ওষধিবনস্পতির কাছেও আমাদের স্পর্দ্ধা থাক্‌বে না—তখন আমরা সত্য করেই বল্‌তে পার্ব্বো, 'যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

৪ঠা পৌষ।

শোনা

কাল সন্ধ্যা থেকে এই গানটি কেবলই আমার মনের মধ্যে ঝঙ্কৃত হচ্চে—“বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।” আমি কোনোমতেই ভুলতে পারচি নে—

বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।
অমল কমল মাঝে, জ্যোৎস্না রজনী মাঝে,
কাজল ঘন মাঝে, নিশি আঁধার মাঝে,
কুসুম সুরভি মাঝে বীণ-রণন শুনি যে
প্রেমে প্রেমে বাজে।

কাল রাত্রে ছাদে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে চেয়ে আমার মন সম্পূর্ণ স্বীকার করেছে “বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে!” এ কবিকথা নয় এ বাক্যালঙ্কার নয়—আকাশ এবং কালকে পরিপূর্ণ করে অহোরাত্র সঙ্গীত বেজে উঠ্‌চে! বাতাসে যখন ঢেউয়ের সঙ্গে ঢেউ সুন্দর

করে খেলিয়ে ওঠে তখন তাদের সেই আশ্চর্য্য মিলন এবং সৌন্দর্য্যকে আমাদের চোখ দেখ্‌তে পায় না, আমাদের কানের মধ্যে সেই লীলা গান হয়ে প্রকাশ পায়। আবার আকাশের মধ্যে যখন আলোর ঢেউ ধারায় ধারায় বিচিত্র তালে নৃত্য করতে থাকে তখন সেই অপরূপ লীলার কোনো খবর আমাদের কান পায় না, চোখের মধ্যে সেইটে রূপ হয়ে দেখা দেয়। যদি এই মহাকাশের লীলাকেও আমরা কানের সিংহদ্বার দিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারতুম তাহলে বিশ্ববীণার এই ঝঙ্কারকে আমরা গান বলেও চিন্‌তে পারতুম।

এই প্রকাণ্ড বিপুল বিশ্ব গানের বন্যা যখন সমস্ত আকাশ ছাপিয়ে আমাদের চিত্তের অভিমুখে ছুটে আসে তখন তাকে এক পথ দিয়ে গ্রহণ করতেই পারিনে, নানা দ্বার খুলে দিতে হয়—চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে, নানা দিক দিয়ে তাকে নানা রকম করে

নিই। এই একতান মহাসঙ্গীতকে আমরা দেখি, শুনি, ছুঁই, শুঁকি, আস্বাদন করি।

এই বিশ্বের অনেকখানিকেই যদিও আমরা চোখে দেখি, কানে শুনি নে, তবুও বহুকাল থেকে অনেক কবি এই বিশ্বকে গানই বলে-চেন। গ্রীসের ভাবুকেরা আকাশে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর গতায়াতকে নক্ষত্রলোকের গান বলেই বর্ণনা করেচেন। কবিরা বিশ্বভুবনের রূপবিন্যাসের সঙ্গে চিত্রকলার উপমা অতি অল্পই দিয়েছেন তার একটা কারণ, বিশ্বের মধ্যে নিয়ত একটা গতির চাঞ্চল্য আছে কিন্তু শুধু তাই নয়—এর মধ্যে গভীরতর একটা কারণ আছে।

ছবি যে আঁকে তার পট চাই, তুলি চাই, রং চাই, তার বাইরের আয়োজন অনেক। তার পরে সে যখন আঁকতে থাকে তখন তার আরম্ভের রেখাতে সমস্ত ছবির আনন্দ দেখা যায় না।—অনেক রেখা এবং অনেক বর্ণ মিললে পর তবেই পরিণামের আভাস পাওয়া যায়।

তার পরে, আঁকা হয়ে গেলে চিত্রকর চলে গেলেও সে ছবি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—চিত্রকরের সঙ্গে তার আর কোনো একান্ত সম্বন্ধ থাকে না।

কিন্তু যে গান করে গানের সমস্ত আয়োজন তার নিজেরই মধ্যে—আনন্দ যার, সুর তারই, কথাও তার—কোনোটাই বাইরের নয়। হৃদয় যেন একেবারে অব্যবহিতভাবে নিজেকে প্রকাশ করে, কোনো উপকরণের ব্যবধানও তার নেই। এই জন্যে গান যদিচ একটা সম্পূর্ণতার অপেক্ষা রাখে তবু তার প্রত্যেক অসম্পূর্ণ সুরটিও হৃদয়কে যেন প্রকাশ করতে থাকে। হৃদয়ের এই প্রকাশে শুধু যে উপকরণের ব্যবধান নেই তা নয়—কথা জিনিষটাও একটা ব্যবধান—কেননা ভেবে তার অর্থ বুঝতে হয়—গানে সেই অর্থ বোঝবারও প্রয়োজন নেই—কোনো অর্থ না থাকলেও কেবলমাত্র সুরই যা বল্‌বার তা অনির্ব্বচনীয় রকম করে বলে।

তার পরে আবার গানের সঙ্গে গায়কের এক মুহূর্ত্ত বিচ্ছেদ নেই—গান ফেলে রেখে গায়ক চলে গেলে গানও তার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায়। গায়কের প্রাণের সঙ্গে শক্তির সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে গানের সুর একেবারে চিরমিলিত হয়েই প্রকাশ পায়। যেখানে গান সেখানেই গায়ক, এর আর কোনো ব্যত্যয় নেই।

এই বিশ্বসঙ্গীতটিও তার গায়ক থেকে এক মুহূর্ত্তও ছাড়া নেই। তাঁর বাইরের উপকরণ থেকেও এ গড়া নয়। একেবারে তাঁরই চিত্ত তাঁরই নিঃশ্বাসে তাঁরই আনন্দরূপ ধরে উঠ্‌চে। এ গান একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে তাঁর অন্তরে রয়েছে, অথচ ক্রমাভিব্যক্তরূপে প্রকাশ পাচ্চে, কিন্তু এর প্রত্যেক সুরেই সেই সম্পূর্ণ গানের আবির্ভাব এক সুরকে আর এক সুরের সঙ্গে আনন্দে সংযুক্ত করে চলেছে। এই বিশ্বগানের যখন কোনো বচনগম্য অর্থও না পাই তখনো আমাদের চিত্তের কাছে এর প্রকাশ

কোনো বাধা পায় না। এযে চিত্তের কাছে চিত্তের অব্যবহিত প্রকাশ।

গায়ত্রীমন্ত্রে তাই ত শুনতে পাই সেই বিশ্ব-সবিতার ভর্গ তাঁর তেজ তাঁর শক্তি ভূর্ভুবঃ স্বঃ হয়ে কেবলি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌চে এবং তাঁরই সেই এক শক্তি কেবলি ধীরূপে আমাদের অন্তরে বিকীর্ণ হচ্চে।' কেবলি উঠ্‌চে, কেবলি আস্‌চে, সুরের পর সুর, সুরের পর সুর।

কাল কৃষ্ণএকাদশীর নিভৃত রাত্রের নিবিড় অন্ধকারকে পূর্ণ করে সেই বীণকার তাঁর রম্য বীণা বাজাচ্ছিলেন; জগতের প্রান্তে আমি একলা দাঁড়িয়ে শুন্‌ছিলুম; সেই ঝঙ্কারে অনন্ত আকাশের সমস্ত নক্ষত্রলোক ঝঙ্কৃত হয়ে অপূর্ব্ব নিঃশব্দ সঙ্গীতে গাঁথা পড়ছিল। তার পরে যখন শুতে গেলুম তখন এই কথাটি মনে নিয়ে নিদ্রিত হলুম যে, আমি যখন সুপ্তিতে অচেতন থাকব তখনো সেই জাগ্রত বীণ-

কারের নিশীথ রাত্রের বীণা বন্ধ হবে না—
তখনো তাঁর যে ঝঙ্কারের তালে নক্ষত্রমণ্ডলীর
নৃত্য চল্‌চে সেই তালে তালেই আমার নিদ্রা-
নিভৃত দেহ-নাট্যশালায় প্রাণের নৃত্য চল্‌তে
থাকবে, আমার হৃৎপিণ্ডের নৃত্য থাম্‌বে না,
সর্ব্বাঙ্গে রক্ত নাচ্‌বে এবং লক্ষ লক্ষ জীবকোষ
আমার সমস্ত শরীরে সেই জ্যোতিষ্কসভার
সঙ্গীতচ্ছন্দেই স্পন্দিত হতে থাক্‌বে।

"বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।" আবার
আমাদের ওস্তাদজি আমাদের হাতেও একটি
করে ছোট বীণা দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছে
আমরাও তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাজাতে
শিখি। তাঁর সভায় তাঁরই সঙ্গে বসে আমরা
একটু একটু সঙ্গত করব এই তাঁর স্নেহের
অভিপ্রায়। জীবনের বীণাটি ছোট কিন্তু
এতে কত তারই চড়িয়েছেন। সব তারগুলি
সুর মিলিয়ে বাঁধা কি কম কথা! এটা হয়ত
ওটা হয়না, মন যদি হল ত আবার শরীর

বাদী হয়—একদিন যদি হল ত আবার আর একদিন তার নেবে যায়। কিন্তু ছাড়লে চলবে না। একদিন তাঁর মুখ থেকে একথাটি শুনতে হবে—বাহাবা, পুত্র, বেশ! এই জীবনের বীণাটি একদিন তাঁর পায়ের কাছে গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া তার সব রাগিণীটি বাজিয়ে তুলবে। এখন কেবল এই কথাটি মনে রাখতে হবে, যে, সব তারগুলি বেশ এঁটে বাঁধা চাই—ঢিল দিলেই ঝনঝন খনখন করে। যেমন এঁটে বাঁধতে হবে তেমনি তাকে মুক্তও রাখতে হবে—তার উপরে কিছু চাপা পড়লে সে আর বাজতে চায় না। নির্ম্মল সুরটুকু যদি চাও তবে দেখো তারে যেন ধুলো না পড়ে—মরচে না পড়ে—আর প্রতিদিন তাঁর পদপ্রান্তে বসে প্রার্থনা কোরো—হে আমার গুরু, তুমি আমাকে বেসুর থেকে সুরে নিয়ে যাও।

৫ই পৌষ।

হিসাব

রোজ কেবল লাভের কথাটাই শোনাতে ইচ্ছে হয়। হিসাবের কথাটা পাড়তে মন যায় না। ইচ্ছে করে কেবল রসের কথাটা নিয়েই নাড়াচাড়া করি, যে পাত্রের মধ্যে সেই রস থাকে সেটাকে বড় কঠিন বলে মনে হয়।

কিন্তু অমৃতের নীচের তলায় সত্য বসে রয়েছেন তাঁকে একেবারে বাদ দিয়ে সেই আনন্দ লোকে যাবার জো নেই।

সত্য হচ্চেন নিয়মস্বরূপ। তাঁকে মান্‌তে হলেই তাঁর সমস্ত বাঁধন মান্‌তেই হয়। যা কিছু সত্য অর্থাৎ যা কিছু আছে এবং থাকে তা কোনোমতেই বন্ধনহীন হতে পারে না— তা কোনো নিয়মে আছে বলেই আছে। যে সত্যের কোনো নিয়ম নেই, বন্ধন নেই, সে ত

স্বপ্ন, সে ত খেয়াল—সে ত স্বপ্নের চেয়েও মিথ্যা, খেয়ালের চেয়েও শূন্য।

যিনি পূর্ণ সত্যস্বরূপ তিনি অন্যের নিয়মে বদ্ধ হন না—তাঁর নিজের নিয়ম নিজেরই মধ্যে। তা যদি না থাকে—তিনি আপনাকে যদি আপনি বেঁধে না থাকেন, তবে তাঁর থেকে কিছুই হতে পারে না, কিছুই রক্ষা পেতে পারে না। তবে উন্মত্ততার তাণ্ডবনৃত্যে কোনো কিছুর কিছুই ঠিকানা থাকৃত না।

কিন্তু আমরা দেখ্‌তে পাচ্চি সত্যের রূপই হচ্চে নিয়ম—একেবারে অব্যর্থ নিয়ম—তার কোনো প্রান্তেও লেশমাত্র ব্যত্যয় নেই। এইজন্যেই এই সত্যের বন্ধনে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধৃত হয়ে আছে—এইজন্যই সত্যের সঙ্গে আমাদের বুদ্ধির যোগ আছে—এবং তার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর আছে।

গাছের যেমন গোড়াতেই দরকার শিকড় দিয়ে ভূমিকে আঁকড়ে ধরা আমাদেরও তেমনি

গোড়ার প্রয়োজন হচ্চে স্থূল সূক্ষ্ম অসংখ্য শিকড় দিয়ে সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠালাভ করা।

আমরা ইচ্ছা করি আর না করি, এ সাধনা আমাদের করতেই হয়। শিশু বলে আমি পা ফেলে চল্‌ব কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত বহু সাধনায় সে চল্‌বার নিয়মটিকে পালন করে' ভারাকর্ষণের সঙ্গে আপস করতে না পারে ততক্ষণ তার আর উপায় নেই—শুধু বল্লেই হবে না আমি চল্‌ব।

এই চলবার নিয়মকে শিশু যখনি গ্রহণ করে এ নিয়ম আর তখন তাকে পীড়া দেয় না। শুধু যে পীড়া দেয় না তা নয় তাকে আনন্দ দেয়; সত্য-নিয়মের বন্ধনকে স্বীকার করবামাত্রই শিশু নিজের গতিশক্তিকে লাভ করে আহ্লাদিত হয়।

এমনি করে ক্রমে ক্রমে যখন সে জলের সত্য, মাটির সত্য, আগুনের সত্যকে সম্পূর্ণ

মান্‌তে শেখে তখন যে কেবল তার কতক-গুলি অসুবিধা দূর হয় তা নয়, জল মাটি আগুন সম্বন্ধে তার শক্তি সফল হয়ে উঠে তাকে আনন্দ দেয়।

শুধু বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নয়, সমাজের সঙ্গেও শিশুকে সত্য সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে ওঠবার জন্যে বিস্তর সাধনা করতে হয়, তাকে বিস্তর নিয়ম স্বীকার করতে হয়—তাকে অনেক রকম আবদার থামাতে হয়, অনেক রাগ কমাতে হয়—নিজেকে অনেক রকম করে বাঁধতে হয় এবং অনেকের সঙ্গে বাঁধতে হয়। যখন এই বন্ধনগুলি মানা তার পক্ষে সহজ হয় তখন সমাজের মধ্যে বাস করা তার পক্ষে আনন্দের হয়ে ওঠে—তখনি তার সামাজিক শক্তি সেই সকল বিচিত্র নিয়মবন্ধনের সাহায্যেই বাধামুক্ত হয়ে স্ফূর্তিলাভ করে।

এমনি করে অধিকাংশ মানুষই যখন বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এবং সমাজের মধ্যে

মোটামুটি রকমে চলনসই হয়ে ওঠে তখনি তারা নিশ্চিন্ত হয়—এবং নিজেকে অনিন্দনীয় মনে করে খুসি হয়।

কিন্তু এমন টাকা আছে যা গাঁয়ে চলে কিন্তু সহরে চলে না—সহরের বাজে দোকানে চলে যায় কিন্তু ব্যাঙ্কে চলে না। ব্যাঙ্কে তাকে ভাঙাতে গেলেই সেখানে যে পোদ্দারটি আছে সে একেবারে স্পর্শমাত্রেই তাকে তৎক্ষণাৎ মেকি বলে বাতিল করে দেয়।

আমাদেরও সেই দশা—আমরা ঘরের মধ্যে, গাঁয়ের মধ্যে, সমাজের মধ্যে নিজেকে চলনসই করে রেখেছি কিন্তু বড় ব্যাঙ্কে যখন দাঁড়াই তখনি পোদ্দারের কাছে একমুহূর্ত্তে আমাদের সমস্ত খাদ ধরা পড়ে যায়।

সেখানে যদি চল্‌তি হতে চাই তবে সত্য হতে হবে, আরো সত্য হতে হবে। আরো অনেক বাঁধনে নিজেকে বাঁধতে হবে, আরো অনেক দায় মান্‌তে হবে। সেই অমৃতের

বাজারে এতটুকু মেকিও চলে না—একেবারে খাঁটি সত্য না হলে অমৃত কেনবার আশা করাও যায় না।

তাই বল্‌ছিলুম কেবল অমৃতরসের কথা ত বল্লেই হবে না, তার হিসাবটাও দেখতে হবে।

আমরা নিজের হিসাব যখন মেলাতে বসি তখন দুচার টাকার গরমিল হলেও বলি ওতে কিছু আসে যায় না। এমনি করে রোজই গরমিলের অংশ কেবলি জমে উঠ্‌চে। প্রকৃতির সঙ্গে এবং মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে প্রত্যহই ছোট-বড় কত অসত্য কত অন্যায়ই চালিয়ে দিচ্চি সে সম্বন্ধে যদি কথা ওঠে ত বলে বসি অমন ত আকৃসার হয়েই থাকে, অমন ত কত লোকেই করে—ওতে করে এমন ঘটে না যে আমি ভদ্রসমাজের বার হয়ে যাই।

ঘোরো হিসাবের খাতায় এইরকম শৈথিল্য বটে কিন্তু যারা জাতিতে সাধু, যারা মহাজন, তারা লাখটাকার কারবারে এক পয়সার

হিসাবটি না মিল্‌লে সমস্ত রাত্রি ঘুমতে পারে না! যারা মস্ত লাভের দিকে তাকিয়ে আছে তারা ছোট্ট গরমিলকেও ডরায়—তারা হিসাবকে একেবারে নিখুঁৎ সত্য না করে বাঁচে না।

তাই বল্‌ছিলুম সেই যে পরম রস প্রেমরস—তার মহাজন যদি হতে চাই তবে হিসাবের খাতাকে নীরস বলে একটু ফাঁকি দিলেও চল্‌বে না। যিনি অমৃতের ভাণ্ডারী তাঁর কাছে বেহিসাবী আবদার একেবারেই খাট্‌বে না। তিনি যে মস্ত হিসাবী—এই প্রকাণ্ড জগদ্ব্যাপারে কোথাও হিসাবের গোল হয় না—তাঁর কাছে কোন্ লজ্জায় গিয়ে বল্‌ব, আমি আর কিছু জানিনে, আর কিছু মানিনে, আমাকে কেবল প্রেম দাও, আমাকে প্রেমে মাতাল করে তোলো।

মৈত্রেয়ী যেদিন অমৃতের জন্যে কেঁদে উঠেছিলেন তিনি সর্ব্বপ্রথমেই বলেছিলেন—

অসতোমাসদ্গময়—আমার জীবনকে আমার চিত্তকে সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল অসত্য হতে সত্যে বেঁধে ফেল—অমৃতের কথা তার পরে।

আমাদেরও প্রতিদিন সেই প্রার্থনাই করতে হবে—বলতে হবে, অসতোমাসদ্গময়—বন্ধনহীন অসংযত অসত্যের মধ্যে আমাদের মন হাজার টুকরো করে ছড়িয়ে ফেলতে দিয়ো না—তাকে অটুট্ সত্যের সূত্রে সম্পূর্ণ করে বেঁধে ফেল—তার পরে সে হার তোমার গলায় যদি পরাতে চাই তবে আমাকে লজ্জা পেতে হবে না।

৬ই পৌষ।

শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের উৎসব

উৎসব ত আমরা রচনা করতে পারিনে যদি সুযোগ হয় তবে উৎসব আমরা আবিষ্কার করতে পারি।

সত্য যেখানেই সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায় সেইখানেই উৎসব। সে প্রকাশ কবেই বা বন্ধ আছে! পাখী ত রোজই ভোর রাত্রি থেকেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে তার সকাল বেলাকার গীতোৎসবের নিত্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্যে। আর প্রভাতের আনন্দ-সভাটিকে সাজিয়ে তোলবার জন্য একটি অন্ধকার পুরুষ সমস্ত রাত্রি কত যে গোপন আয়োজন করে তার কি সীমা আছে! শুতে যাবার আগে একবার যদি কেবল তাকিয়ে দেখি তবে দেখতে পাইনে

কি, জগতের নিত্য উৎসবের মহাবিজ্ঞাপন সমস্ত আকাশ জুড়ে কে টাঙিয়ে দিয়েছে!

এর মধ্যে আমাদের উৎসবটা কবে? যে দিন আমরা সময় করতে পারি সেই দিন। যে দিন হঠাৎ হুঁস্ হয় যে আমাদের নিমন্ত্রণ আছে এবং সে নিমন্ত্রণ প্রতিদিন মারা যাচ্চে। যেদিন স্নান করে সাজ করে ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি।

সেইদিন উৎসবের সকালে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলি—বাঃ আজ আলোটি কি মধুর কি পবিত্র! আরে মূঢ়, এ আলো কবে মধুর ছিল না, কবে পবিত্র ছিল না! তুমি একটা বিশেষ দিনের গায়ে একটা বিশেষ চিহ্ন কেটে দিয়েছ বলেই কি আকাশের আলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলেছে!

আর কিছু নয়—আজকে নিমন্ত্রণরক্ষা করতে এসেছি অন্যদিন করিনি, এইমাত্র তফাৎ। আয়োজনটা এমনিই প্রতিদিনই

ছিল, প্রতিদিনই আছে। জগৎ যে আনন্দরূপ এইটে আজ দেখ্‌ব বলে কাজকর্ম্ম ফেলে এসেছি। শুধু তাই নয়, আমিও নিজের আনন্দময় স্বরূপটিকেই ছুটি দিয়েছি—আজ বলেছি, থাক্‌ আজ দেনাপাওনার টানাটানি, ঘুচুক্‌ আজ আত্মপরের ভেদ, মরুক্‌ আজ সমস্ত কার্পণ্য, বাহির হোক্‌ আজ যত ঐশ্বর্য্য আছে! যে আনন্দ জলেস্থলে আকাশে সর্ব্বত্র বিরাজমান সেই আনন্দকে আজ আমার আনন্দনিকেতনের মধ্যে দেখ্‌ব—যে উৎসব নিখিলের উৎসব সেই উৎসবকে আজ আমার উৎসব করে তুলব।

বিশ্বের একটা মহল ত নয়। তার নানা-মহলে নানারকম উৎসবের ব্যবস্থা হয়ে আছে। সজনে নির্জ্জনে নানাক্ষেত্রে উৎসবের নানা ভিন্ন ভাব, আনন্দের নানা ভিন্ন মূর্ত্তি। নীলাকাশতলে প্রসারিত প্রান্তরের মাঝখানে এই ছায়াস্নিগ্ধ নিভৃত আশ্রমের যে প্রাত্যহিক

উৎসব—আমরা আশ্রমের আশ্রিতগণ কি সেই উৎসবে সূর্য্যতারা ও তরুশ্রেণীর সঙ্গে কোনোদিন যোগ দিয়েছি? আমরা এই আশ্রমটিকে কি তার সমস্ত সত্যে ও সৌন্দর্য্যে দেখেছি? দেখিনি। এই আশ্রমের মাঝখানে থেকেও আমরা প্রতিদিন প্রাতে সংসারের মধ্যেই জেগেছি এবং প্রতিদিন রাত্রে সংসারের কোলেই শুয়েছি।

৩৬৪ দিন পরে আজ আমরা আশ্রমবাসিগণ এই আশ্রমকে দেখ্‌তে এসেছি। যখন সূর্য্য পূর্ব্বগগনকে আলো করে ছিল, তখন দেখ্‌তে পাইনি—যখন আকাশ ভরে তারার দীপমালা জলেছিল তখনো দেখ্‌তে পাইনি—আজ আমাদের এই ক'টা তেলের আলো বাতির আলো জ্বালিয়ে এ'কে দেখ্‌ব! তা হোক্, তাতে অপরাধ নেই। মহেশ্বরের মহোৎসবের সঙ্গে যোগ দিতে গেলে আমাদেরও যেটুকু আলোর সম্বল আছে তাও

বের করতে হয়। শুধু তাঁর আলোতেই তাঁকে দেখ্‌ব এ যদি হত তাহলে সহজেই চুকে যেত —কিন্তু এইটুকু কড়ায় তিনি আমাদের দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন যে আমাদের আলোটুকুও জ্বাল্‌তে হবে—নইলে দর্শন হবে না, মিলন ঘটবে না—আমাদের যে অহঙ্কারটি দিয়ে রেখেছেন সে এরই জন্তে। অহঙ্কারে আগুন জ্বেলে আমরা মহোৎসবের মশাল তৈরি করব। তাই চিরজাগ্রত আনন্দকে দেখবার জন্যে আমার নিজের এইটুকু আনন্দকেও জাগিয়ে তুল্‌তে হয়, সেই চিরপ্রকাশিত জ্ঞানকেও জানবার জন্তে আমার জ্ঞানটুকুর ক্ষুদ্র পল্‌তেটিকে উস্‌কে দিতে হয়—আর যাঁর প্রেম আপনি প্রবাহিত হয়ে ছাপিয়ে পড়চে তাঁর সেই অফুরান প্রেমকেও আমরা উপলব্ধি করতে পারিনে যদি ছোট জুঁইফুলটির মত আমাদের এই এতটুকু প্রেমকে না ফুটিয়ে তুল্‌তে পারি।

এইজন্যেই বিশ্বেশ্বরের জগদ্ব্যাপী মহোৎসবেও আমরা ঠিকমত যোগ দিতে পারি না যদি আমরা নিজের ক্ষুদ্র আয়োজনটুকু নিয়ে উৎসব না করি। আমাদের অহঙ্কার আজ তাই আকাশ-পরিপূর্ণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর চোখের সাম্‌নে নিজের এই দরিদ্র আলো কয়টা নির্লজ্জভাবে জ্বালিয়েছে। আমাদের অভিমান এই যে, আমরা নিজের আলো দিয়েই তাঁকে দেখ্‌ব। আমাদের এই অভিমানে মহাদেব খুসি—তিনি হাস্‌চেন। আমাদের এ প্রদীপ ক'টা জ্বালা দেখে সেই কোটি সূর্য্যের অধিপতি আনন্দিত হয়েছেন। এই ত তাঁর প্রসন্ন মুখ দেখবার শুভ অবসর। এই সুযোগটিতে আমাদের সমস্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এই চেতনা আমাদের সমস্ত শরীরে জেগে উঠে রোমে রোমে পুলকিত হোক্‌—এই চেতনা দিবালোকের তরঙ্গে তরঙ্গে স্পন্দিত হোক্‌, নিশীথরাত্রির অন্ধকারের মধ্যে

পরিব্যাপ্ত হোক্—আজ সে যেন ঘরের কোণে ঘরের চিন্তায় বিক্ষিপ্ত না হয়, নিখিলের পক্ষে যেন মিথ্যা হয়ে না থাকে—আজ সে কোনো-খানে সঙ্কুচিত হয়ে বঞ্চিত না হয়। অনন্ত সভার সমস্ত আয়োজন, সমস্ত দর্শন স্পর্শন মিলন কেবল এই চৈতন্যের উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে—এইজন্যে আলো জ্বল্‌চে, বাঁশি বাজ্‌চে—দূতগুলি চতুর্দ্দিক থেকেই দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে—সমস্তই প্রস্তত—ওরে চেতনা তুই কোথায়! ওরে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত!

৭ই পৌষ।

দীক্ষা

একদিন যাঁর চেতনা বিলাসের আরামশয্যা থেকে হঠাৎ জেগে উঠেছিল—এই ৭ই পৌষ দিনটি সেই দেবেন্দ্রনাথের দিন। এই দিনটিকে তিনি আমাদের জন্যে দান করে গিয়েছেন। রত্ন যেমন করে দান করতে হয় তেমনি করে দান করেছেন। ঐ দিনটিকে এই আশ্রমের কৌটোটির মধ্যে স্থাপন করে দিয়ে গেছেন। আজ কৌটো উদ্‌ঘাটন করে রত্নটিকে এই প্রান্তরেব আকাশের মধ্যে তুলে ধরে দেখ্‌বো—এখানকার ধূলিবিহীন নির্ম্মল নিভৃত আকাশতলে যে নক্ষত্রমণ্ডলী দীপ্তি পাচ্ছে সেই তারাগুলির মাঝখানে তাকে তুলে ধরে দেখ্‌ব। সেই সাধকের জীবনের ৭ই পৌষকে আজ উদ্‌ঘাটন করার দিন—সেই নিয়ে আমরা আজ উৎসব করি।

এই ৭ই পৌষের দিনে সেই ভক্ত তাঁর দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন—সেই দীক্ষার যে কত বড় অর্থ আজকের দিন কি সে কথা আমাদের কাছে কিছু বলচে? সেই কথাটি না শুনে গেলে কি জন্তেই বা এসেছি আর কি নিয়েই বা যাব?

সেই যেদিন তাঁর জীবনে এই ৭ই পৌষের সূর্য্য একদিন উদিত হয়েছিল সেই দিনে আলোও জলেনি, জনসমাগমও হয় নি—সেই শীতের নির্ম্মল দিনটি শান্ত ছিল স্তব্ধ ছিল। সেই দিনে যে কি ঘট্‌চে তা তিনি নিজেও সম্পূর্ণ জানেন নি, কেবল অন্তর্যামী বিধাতা-পুরুষ জান্‌ছিলেন।

সেই যে দীক্ষা সেদিন তিনি গ্রহণ করে-ছিলেন সেটি সহজ ব্যাপার নয়। সে শুধু শান্তির দীক্ষা নয় সে অগ্নির দীক্ষা। তাঁর প্রভু সেদিন তাঁকে বলেছিলেন, এই যে জিনিষটি তুমি আজ আমার হাত থেকে নিলে

এটি যে সত্য—এর ভার যখন গ্রহণ করেছ, তখন তোমার আর আরাম নেই, তোমাকে রাত্রিদিন জাগ্রত থাকতে হবে। এই সত্যকে রক্ষা করতে তোমার যদি সমস্তই যায় ত সমস্তই যাক্। কিন্তু সাবধান, তোমার হাতে আমার সত্যের অসম্মান না ঘটে।

তাঁর প্রভুর কাছ থেকে এই সত্যের দান নিয়ে তার পরে আর ত তিনি ঘুমতে পারেন নি। তাঁর আত্মীয় গেল, ঘর গেল, সমাজ গেল, নিন্দায় দেশ ছেয়ে গেল—এত বড় বৃহৎ সংসার, এত মানী বন্ধু, এত ধনী আত্মীয়, এত তাঁর সহায়—সমস্তের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেল এমন দীক্ষা তিনি নিয়েছিলেন। জগতের সমস্ত আনুকূল্যকে বিমুখ করে দিয়ে এই সত্যটি নিয়ে তিনি দেশে দেশে অরণ্যে পর্ব্বতে ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন! এ যে প্রভুর সত্য! এই অগ্নি রক্ষার ভার নিয়ে আর আরাম নেই আর নিদ্রা নেই! রুদ্রদেবের সেই

অগ্নিদীক্ষা আজকের দিনের উৎসবের মাঝখানে আছে। কিন্তু সে কি প্রচ্ছন্নই থাকবে? এই গীত বাদ্য কোলাহলের মাঝখানে প্রবেশ করে' সেই ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং যিনি, তাঁর দীপ্ত সত্যের বজ্রমূর্ত্তি আজ প্রত্যক্ষ করে যাবে না? গুরুর হাত হতে সেই যে "বজ্রমুদ্যতং" তিনি গ্রহণ করেছিলেন এই ৭ই পৌষের মর্ম্মস্থানে সেই বজ্রতেজ রয়েছে।

কিন্তু শুধু বজ্র নয়, শুধু পরীক্ষা নয়, সেই দীক্ষার মধ্যে যে কি বরাভয় আছে তাও দেখে যেতে হবে। সেই ধনিসন্তানের জীবনে যে সঙ্কটের দিন এসেছিল তাতো সকলের জানা আছে। যে বিপুল ঐশ্বর্য্য রাজহর্ম্ম্যের মত একদিন তাঁর আশ্রয় ছিল সেইটে যখন অকস্মাৎ তাঁর মাথার উপরে ভেঙে পড়ে তাঁকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার উদ্যোগ করেছিল তখন সেই ভয়ঙ্কর বিপৎ-পতনের মাঝখানে একমাত্র এই সত্যদীক্ষা

তাঁকে আবৃত করে রক্ষা করেছিল—সেই দিনে তাঁর আর কোনো পার্থিব সহায় ছিল না। এই দীক্ষা শুধু যে দুর্দ্দিনের দারুণ আঘাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছিল তা নয়—প্রলোভনের দারুণতর আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করেছিল।

আজকের এই ৭ই পৌষের মাঝখানে তাঁর সেই সত্য দীক্ষার রুদ্রদীপ্তি এবং বরাভয়রূপ দুইই রয়েছে—সেটি যদি আমরা দেখ্‌তে পাই এবং লেশমাত্রও গ্রহণ করতে পারি তবে ধন্য হব। সত্যের দীক্ষা যে কাকে বলে আজ যদি ভক্তির সঙ্গে তাই স্মরণ করে যেতে পারি তাহলে ধন্য হব। এর মধ্যে ফাঁকি নেই, লুকোচুরি নেই, দ্বিধা নেই, দুই দিক বজায় রেখে চল্‌বার চাতুরী নেই, নিজেকে ভোলা-বার জন্যে সুনিপুণ মিথ্যাযুক্তি নেই, সমাজকে প্রসন্ন করবার জন্যে বুদ্ধির দুই চক্ষু অন্ধ করা নেই, মানুষের হাটে বিকিয়ে দেবার

জন্যে ভগবানের ধন চুরি করা নেই। সেই সত্যকে সমস্ত দুঃখপীড়নের মধ্যে স্বীকার করে নিলে তার পরে একেবারে নির্ভয়—ধূলিঘর ভেঙে দিয়ে একেবারে পিতৃভবনের অধিকার লাভ—চিরজীবনের যে গম্যস্থান যে অমৃত-নিকেতন সেই পথের যিনি একমাত্র বন্ধু তাঁরই আশ্রয় প্রাপ্তি, সত্য দীক্ষার এই অর্থ।

সেই সাধু সাধক তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড় দিনটি, তাঁর দীক্ষার দিনটিকে এই নির্জ্জন প্রান্তরের মুক্ত আকাশ ও নির্ম্মল আলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে দিয়ে গেছেন। তাঁর সেই মহাদিনটির চারদিকে এই মন্দির, এই আশ্রম, এই বিদ্যালয় প্রতিদিন আকার ধারণ করে উঠ্‌চে; আমাদের জীবন, আমাদের হৃদয়, আমাদের চেতনা এ'কে বেষ্টন করে দাঁড়িয়েছে; এই দিনটিরই আহ্বানে কল্যাণ মূর্ত্তিমান হয়ে এখানে আবির্ভূত হয়েছে; এবং তাঁর সেই সত্য-দীক্ষার দিনটি

ধনী ও দরিদ্রকে, বালক ও বৃদ্ধকে, জ্ঞানী ও মূর্খকে বর্ষে বর্ষে আনন্দউৎসবে আমন্ত্রণ করে আনচে। এই দিনটিকে যেন আমাদের অন্য-মনস্ক জীবনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে না রাখি—এ'কে ভক্তিপূর্ব্বক সমাদর করে ভিতরে ডেকে নাও—আমাদের তুচ্ছ জীবনের প্রতিদিনের যে দৈন্য তাকে সম্পদে পূর্ণ কর।

হে দীক্ষাদাতা, হে গুরু, এখনো যদি প্রস্তুত হয়ে না থাকি ত প্রস্তুত কর—আঘাত কর—চেতনাকে সর্ব্বত্র উদ্যত কর—ফিরিয়ে দিয়োনা, ফিরিয়ে দিয়োনা—দুর্ব্বল বলে, তোমার সভাসদদের সকলের পশ্চাতে ঠেলে রেখোনা। এই জীবনে সত্যকে গ্রহণ করতেই হবে—নির্ভয়ে এবং অসঙ্কোচে। অসত্যের স্তূপাকার আবর্জ্জনার মধ্যে ব্যর্থ জীবনকে নিক্ষেপ করব না। দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে—তুমি শক্তি দাও!

৭ই পৌষ

মানুষ

কালকের উৎসবমেলার দোকানী পসারীরা এখনো চলে যায়নি। সমস্ত রাত তারা এই মাঠের মধ্যে আগুন জেলে গল্প করে গান গেয়ে বাজনা বাজিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে।

কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর শীতরাত্রি। আমি যখন আমাদের নিত্য উপাসনার স্থানে এসে বস্‌লুম তখনো রাত্রি প্রভাত হতে বিলম্ব আছে। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার;—এখানকার ধূলিবাষ্পশূন্য স্বচ্ছ আকাশের তারাগুলি দেব-চক্ষুর অক্লিষ্ট জাগরণের মত অক্লান্তভাবে প্রকাশ পাচ্চে। মাঠের মাঝে মাঝে আগুন্ জ্বল্‌চে—ভাঙা মেলার লোকেরা শুক্‌নো পাতা জ্বালিয়ে আগুন পোয়াচ্চে।

অন্যদিন এই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে কি শান্তি, কি স্তব্ধতা! বাগানের সমস্ত পাখী জেগে গেয়ে

উঠ্‌লেও সে স্তব্ধতা নষ্ট হয় না—শালবনের মর্ম্মরিত পল্লবরাশির মধ্যে পৌষের উত্তরে হাওয়া দুরন্ত হয়ে উঠলেও সেই শান্তিকে স্পর্শ করে না।

কিন্তু কয়জন মানুষে মিলে যখন কলরব করে তখন প্রভাত-প্রকৃতির এই স্তব্ধতা কেন এমন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে! উপাসনার জন্যে সাধক পশুপক্ষীহীন স্থান ত খোঁজে না, মানুষহীন স্থান খুঁজে বেড়ায় কেন?

তার কারণ এই যে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পূর্ণ ঐক্য নেই। বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে মানুষ একটানে একতালে চলে না। এই জন্যেই যেখানেই মানুষ থাকে সেই খানেই চারিদিকে সে নিজের একটা তরঙ্গ তোলে,—সে একটিমাত্র কথা না বল্লেও তারার মত নিঃশব্দ ও একটু মাত্র নড়াচড়া না করলেও বনস্পতির মত নিস্তব্ধ থাকে না। তার অস্তিত্বই অগ্রসর হয়ে আঘাত করে।

ভগবান ইচ্ছা করেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সামঞ্জস্য একটু খানি নষ্ট করে দিয়েছেন—এই তাঁর আনন্দের কৌতুক। ঐযে আমাদের পঞ্চভূতের মধ্যে একটু বুদ্ধির সঞ্চার করেছেন, একটা অহঙ্কার যোজনা করে বসে আছেন—তাতে করেই আমরা বিশ্ব থেকে আলাদা হয়ে গেছি—ঐ জিনিষটার দ্বারাতেই আমাদের পংক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। এই জন্যেই গ্রহসূর্য্য তারার সঙ্গে আমরা আর মিল রক্ষা করে চল্‌তে পারিনে—আমরা যেখানে আছি সেখানে যে আমরা আছি এ কথাটা আর কারো ভোল্‌বার জো থাকে না।

ভগবান আমাদের সেই সামঞ্জস্যটি নষ্ট করে প্রকৃতির কাছ থেকে আমাদের একঘরে করে দেওয়াতে সকাল বেলা থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের নিজের কাজের ধন্দায় নিজে ঘুরে বেড়াতে হয়।

ঐ সামঞ্জস্যটি ভেঙে গেছে বলেই আমাদের প্রকৃতির মধ্যে বিরাট বিশ্বের শান্তি নেই—আমাদের ভিতরকার নানা মহল থেকে রব উঠেছে, চাই, চাই, চাই! শরীর বল্‌চে, চাই, মন বল্‌চে, চাই, হৃদয় বল্‌চে, চাই—এক মুহূর্ত্তেও এই রবের বিশ্রাম নেই। যদি সমস্তর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন মিল থাকৃত তাহ্‌লে আমাদের মধ্যে এই হাজার সুরে চাওয়ার বালাই থাকৃত না।

আজ অন্ধকার প্রত্যূষে বসে আমার চারদিকে সেই বিচিত্র চাওয়ার কোলাহ্‌ল শুন্‌ছিলুম—কত দরকারের হাঁক! ওরে গোরুটা কোথায় গেল, অমুক কই, আগুন চাইরে, তামাক কোথায়, গাড়িটা ডাকরে, হাঁড়িটা পড়ে রইল যে।

এক জাতের পাখী সকালে যখন গান গায় তখন তারা এক সুরে এক রকমেরই গান গায়—কিন্তু মানুষের এই যে কলধ্বনি

তাতে এক জনের সঙ্গে আর এক জনের না আছে বাণীর মিল, না আছে সুরের।

কেননা ভগবান ঐ যে অহঙ্কারটি জুড়ে দিয়ে আমাদের জগতের সঙ্গে ভেদ জন্মিয়ে দিয়েছেন তাতে আমাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন। আমাদের রুচি, আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা সমস্তই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র আশ্রয় করে এক একটি অপরূপ মূর্তি ধরে বসে আছে। কাজেই একের সঙ্গে আরের ঠেকাঠেকি ঠোকাঠুকি চলেইছে। কাড়াকাড়ি টানাটানির অন্ত নেই। তাতে কত বেসুর কত উত্তাপ যে জন্মাচ্ছে তার আর সীমা নেই। সেই বেসুরে পীড়িত সেই তাপে তপ্ত আমাদের স্বাতন্ত্র্যগত অসামঞ্জস্য কেবলি সামঞ্জস্যকে প্রার্থনা করচে, সেই জন্যেই আমরা কেবলমাত্র খেয়ে পরে জীবন ধারণ করে বাঁচিনে। আমরা একটা সুরকে একটা মিলকে চাচ্চি। সে চাওয়াটা আমাদের

খাওয়াপরার চাওয়ার চেয়ে বেশি বই কম নয়—সামঞ্জস্য আমাদের নিতান্তই চাই। সেই জন্যেই কথা নেই বার্ত্তা নেই আমরা কাব্য রচনা করতে বসে গেছি—কত লিখ্‌চি, কত আঁকচি, কত গড়চি! কত গৃহ কত সমাজ বাঁধচি, কত ধর্ম্মমত ফাঁদচি—আমাদের কত অনুষ্ঠান, কত প্রতিষ্ঠান, কত প্রথা! এই সামঞ্জস্যের আকাঙ্ক্ষার তাগিদে নানা দেশের মানুষ কত নানা আকৃতির রাজ্যতন্ত্র গড়ে তুল্‌চে! কত আইন, কত শাসন, কত রকম-বেরকমের শিক্ষাদীক্ষা! কি করলে নানা মানুষের নানা অহঙ্কারকে সাজিয়ে একটি বিচিত্র সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হতে পারে এই চেষ্টায় এই তপস্যায় পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মানুষ ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

এই চেষ্টার তাড়নাতেই মানুষ আপনার একটা সৃষ্টি তৈরি করে তুল্‌চে—নিখিল সৃষ্টি থেকে এই অহঙ্কারের মধ্যে নির্ব্বাসিত হওয়াতেই

তার এই নিজের সৃষ্টির এত অধিক প্রয়োজন হয়ে উঠেছে! মানুষের ইতিহাস কেবলি এই সৃষ্টির ইতিহাস, এই সমন্বয়ের ইতিহাস ;— তার সমস্ত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, সমস্ত ভাব ও কল্পনার মধ্যে কেবলি এই অমিলের মেলবার ইতিহাস রচিত হচ্চে। পেতে চাই, পেতে চাই, মিল্‌তে চাই, মিল্‌তে চাই! এ ছাড়া আর কথা নেই।

সেইজন্যে এই মাঠ জুড়ে নানা লোকের নানা স্বতন্ত্র প্রয়োজনের নানা কলরবের মধ্যে যখন শুনলুম একজন গান গাচ্চে, "হরি আমায় বিনামূল্যে পার করে দাও" তখন সেই গানটির ভিতর এই সমস্ত কলরবের মাঝখানটির কথা আমি শুন্‌তে পেলুম! সমস্ত চাওয়ার ভিতর-কার চাওয়া হচ্চে এই পার হতে চাওয়া! যে বিচ্ছিন্ন সে কেবলি বল্‌চে, ওগো আমাকে এই বিচ্ছেদ উত্তীর্ণ করে দাও! এই বিচ্ছেদ পার হলেই তবে যে প্রেম পূর্ণ হয়। এই প্রেম পূর্ণ না হলে কোনো কিছু পেয়েই আমার

তৃপ্তি নেই—নইলে কেবলি মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে যাচ্চি—একের থেকে আরে ঘুরে মরচি —মিলে গেলেই এই বিষম আপদ চুকে যায়।

কিন্তু যে মিলটি হচ্চে অমৃত, তাকে পেতে গেলেই ত বিচ্ছেদের ভিতর দিয়েই পেতে হয়! মিলে থাক্‌লে ত মিলকে পাওয়া হয় না!

সেই জন্যে ঈশ্বর যে অহঙ্কার দিয়ে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েচেন সেটা তাঁর প্রেমেরই লীলা। অহঙ্কার না হলে বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ না হলে মিলন হয় না—মিলন না হলে প্রেম হয় না। মানুষ তাই বিচ্ছেদ-পারাবারের পারে বসে প্রেমকেই নানা আকারে চাইতে চাইতে নানা রকমের তরী গড়ে তুল্‌চে—এ সমস্তই তার পার হবার তরণী— রাজ্যতন্ত্রই বল, সমাজতন্ত্রই বল, আর ধর্ম্মতন্ত্রই বল!

কিন্তু তাই যদি হয় তবে পার হয়ে যাব কোথায়? তবে কি অহঙ্কারকে একেবারেই লুপ্ত

করে দিয়ে সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদের দেশে যাওয়াই অমৃতলোক প্রাপ্তি? সেই দেশেই ত ধূলা মাটি পাথর রয়েচে। তারা ত সমষ্টির সঙ্গে একতানে মিলে চলেচে কোনো বিচ্ছেদ জানে না। এই রকমের আত্মবিলয়ের জন্যেই কি মানুষ কাঁদচে?

কখনই নয়; তা যদি হত সকল প্রকার বিলয়ের মধ্যেই সে সান্ত্বনা পেত, আনন্দ পেত। বিলুপ্তিকে যে মানুষ সর্ব্বান্তঃকরণে ভয় করে তার প্রমাণ প্রয়োগের কোনো দরকার নেই। কিছু একটা গেল একথার স্মরণ তার সুখের স্মরণ নয়। এই আশঙ্কা এবং এই স্মরণের সঙ্গেই তার জীবনের গভীর বিষাদ জড়িত—সে ধরে রাখ্‌তে চায় অথচ ধরে রাখতে পারে না। মানুষ সর্ব্বান্তঃকরণে যদি কিছুকে না চায় ত সে বিলয়কে।

তাই যদি হল তবে যে অসামঞ্জস্য, যে বিচ্ছেদের উপর তার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত,

সেইটেকে কি সে চায়? তাও ত চায় না। এই বিচ্ছেদ এই অসামঞ্জস্যের জন্যেই ত সে চিরদিন কেঁদে মরচে! তার যত পাপ যত তাপ সে ত এ'কেই আশ্রয় করে। এই জন্যেই ত সে গান গেয়ে উঠ্‌চে—হরি আমায় বিনামূল্যে পার কর! কিন্তু পারে যাওয়া যদি লুপ্ত হওয়াই হল তবে ত আমরা মুস্কিলেই পড়েছি! তবে ত এপারে দুঃখ আর ওপারে ফাঁকি!

আমরা কিন্তু দুঃখকেও চাইনে ফাঁকিকেও চাইনে। তবে আমরা কি চাই, আর সেটা পাবই বা কি করে!

আমরা প্রেমকেই চাই। কখন সেই প্রেমকে পাই? যখন বিচ্ছেদ-মিলনের সামঞ্জস্য ঘটে; যখন বিচ্ছেদ মিলনকে নাশ করে না এবং মিলনও বিচ্ছেদকে গ্রাস করে না—দুই যখন একসঙ্গে থাকে, অথচ তাদের মধ্যে আর বিরোধ থাকে না—তারা পরস্পরের সহায় হয়।

এই ভেদ ও ঐক্যের সামঞ্জস্যের জন্যেই আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা। আমরা এর কোনোটাকেই ছাড়তে চাইনে। আমাদের যা কিছু প্রয়াস যা কিছু সৃষ্টি সে কেবল এই ভেদ ও অভেদের অবিরুদ্ধ ঐক্যের মূর্তি দেখবার জন্যেই—দুইয়ের মধ্যেই এককে লাভ করবার জন্যে। আমাদের প্রেমের ভগবান যখন আমাদের পার করবেন তখন তিনি আমাদের চিরদুঃখের বিচ্ছেদকেই চিরন্তন আনন্দের বিচ্ছেদ করে তুলবেন। তখন তিনি আমাদের এই বিচ্ছেদের পাত্র ভরেই মিলনের সুধা পান করাবেন। তখনই বুঝিয়ে দেবেন বিচ্ছেদটি কি অমূল্য রত্ন।

৮ই পৌষ

ভাঙা হাট

মানুষের মনটা কেবলি যেমন বল্‌চে চাই, চাই, চাই—তেমনি তার পিছনে পিছনেই আর একটি কথা বল্‌চে, চাইনে, চাইনে, চাইনে। এইমাত্র বলে, না হলে নয়, পরক্ষণেই বলে কোনো দরকার নেই।

ভাঙা মেলার লোকেরা কাল রাত্রে বলেছিল, গোটাকতক কাঠকুটা লতাপাতা পেলে বেঁচে যাই, তখন এম্‌নি হয়েছিল যে, না হলে চলে না! শীতে খোলা মাঠের মধ্যে ঐ একটুখানি আশ্রয় রচনা করাই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজনসাধন বলে মনে হয়েছিল। কোনোমতে একটা চুলো বানিয়ে শুক্‌নো পাতা জ্বালিয়ে যা হোক্ কিছু একটা রেঁধে নিয়ে আহার করবার চেষ্টাও অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল। এ চাওয়া ও চেষ্টার কাছে

পৃথিবীর আর সমস্তব্যাপারই ছোট হয়ে গিয়েছিল।

কোনো গতিকে এই কাঠকুট পাতা লতা সংগ্রহ হয়েছিল। কিন্তু আজ রাত্রি না যেতেই শুন্‌তে পাচ্চি—"ওরে গাড়ি কোথায় রে, গোরু জোত রে।" যেতে হবে, এবার গ্রামে যেতে হবে। এই চলে যাওয়ার প্রয়োজনটাই এখন সকলের বড়। কাল রাত্রিবেলাকার একান্ত প্রয়োজনগুলো আজ আবর্জ্জনা হয়ে পড়ে রইল, —কাল যাকে বলেছিল বড় দরকার, আজ তাকে পরিত্যাগ করে যাবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত?

বিশ্বমানবও এমনি করেই এক যুগ থেকে আর এক যুগে যাবার আয়োজন করচে। যখন নূতন প্রভাত উঠ্‌চে, যখন রাত ভোর হবে হবে করচে—তখন এ ওকে ঠেলাঠেলি করে ডাকৃচে—ওরে চল্‌রে—ওরে গোরু কোথায়রে, ওরে গাড়ি কোথায়! তখন ঐ রাত্রির অত্যন্ত প্রয়োজনের সামগ্রীগুলো

এই দিনের আলোতে অত্যন্ত আবর্জ্জনা হয়ে লজ্জিত হয়ে পড়ে রইল। শুকনো পাতা থেকে এখনো ধোঁয়া উঠ্‌চে, তার ছাইগুলো জমে উঠ্‌চে। ভাঙা হাঁড়ি সরা শালপাতায় মাঠ বিকীর্ণ। আশ্রয়-গৃহগুলি আশ্রিতদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে অত্যন্ত শ্রীভ্রষ্ট ও লজ্জিত হয়ে আছে। সমস্তই রইল—পূর্ব্বআকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে—এবারে যাত্রা করে বেরতে হবে। আবার, আবার আর এক যুগের প্রয়োজন সংগ্রহ করতে হবে। তখন মনে হবে এইবারকার এই প্রয়োজনগুলিই চরম—আর কোনোদিন ভোরের বেলায় গাড়িতে গোরু জুৎতে হবে না। এই বলে আবার কাঠকুট, ডালপালা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। কিন্তু তখনো এই অত্যন্ত একান্ত প্রয়োজনের দূর সম্মুখ দিগন্ত থেকে করুণ ভৈরবীসুরে বাণী আস্‌ছে, প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই!

যদি এই সুরটুকু না থাকৃত—যদি এই

অত্যন্ত প্রয়োজনের ভিতরেই অত্যন্ত অপ্রয়ো-
জন বাস না করত তা হলে কি আমরা
বাঁচতে পারতুম! প্রয়োজন যদি সত্যই একান্ত
হত তা হলে তার ভয়ঙ্কর চাপ কে সহ্য করতে
পারত! অত্যন্ত অপ্রয়োজন অহোরাত্র এই
অত্যন্ত প্রয়োজনের ভার হরণ করে রয়েছে
বলেই আমরা দয়স্কারের অতি প্রবল মাধ্যা-
কর্ষণের মধ্যেও চলাফেরা করে বেড়াতে
পারচি। সেই জন্যেই ভোরের আলো দেখা
দেবামাত্রই রাশীকৃত বোঝা যেখানে সেখানে
যেমন তেমন করে ফেলে রেখে আমরা গাড়িতে
চড়ে বস্‌তে পারচি। "কিছুই থাকে না" বলে
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলচি—তেমনি "কিছুই নড়ে না"
বলে হতাশ হয়ে পড়চিনে। থাকৃচেও বটে
যাচ্চেও বটে এই দুইয়ের মাঝখানে আমরা
ফাঁকও পেয়েছি, আশ্রয়ও পেয়েছি—আমাদের
ঘরও জুটেছে আলো বাতাসও মারা যায় নি!

৮ই পৌষ

উৎসব-শেষ

আমরা অনেক সময় উৎসব করে ফতুর হয়ে যাই। ঋণশোধ করতেই দিন বয়ে যায়। অল্পসম্বল ব্যক্তি যদি একদিনের জন্যে রাজা হওয়ার সখ মেটাতে যায়, তবে তার দশদিনকে সে দেউলে করে দেয়, আর ত কোনো উপায় নেই।

সেই জন্যে উৎসবের পরদিন আমাদের কাছে বড় ম্লান। সে দিন আকাশের আলোর উজ্জ্বলতা চলে যায়—সে দিন অবসাদে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু উপায় নেই। মানুষ বৎসরে অন্তত একটা দিন নিজের কার্পণ্য দূর করে' তবে সেই অকৃপণের সঙ্গে আদান প্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন কর্ত্তে চায়। ঐশ্বর্য্যের দ্বারা সেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে।

দুই রকমের উপলব্ধি আছে। এক রকম —দরিদ্র যেমন ধনীকে উপলব্ধি করে, দান-প্রাপ্তির দ্বারা। এই উপলব্ধিতে পার্থক্যটাকেই বেশি করে বোঝা যায়। আর এক রকম উপলব্ধি হচ্চে সমকক্ষতার উপলব্ধি। সেই স্থলে আমাকে দ্বারের বাইরে বসে থাকতে হয় না— কতকটা এক জায়গায় বসা চলে।

প্রতিদিন যখন আমরা দীনভাবে থাকি তখন নিরানন্দচিত্তটা আনন্দময়ের কাছে ভিক্ষুকতা করে। উৎসবের দিনে সেও বলতে চায়, আজ কেবল নেওয়া নয় আজ আমিও তোমার মত আনন্দ করব—আজ আমার দীনতা নেই কৃপণতা নেই, আজ আমার আনন্দ এবং আমার ত্যাগ তোমারই মত অজস্র।

এইরূপে ঐশ্বর্য্য জিনিষটি কি, অকৃপণ প্রাচুর্য্য কাকে বলে সেটা নিজের মধ্যে অনুভব করলে ঈশ্বর যে কেবলমাত্র আমার অনুগ্রহকর্ত্তা

নন তিনি যে আমার আত্মীয় সেটা আমি বুঝি এবং প্রমাণ করি।

কিন্তু এইটে বুঝতে এবং প্রচার করতে গিয়ে অনেক সময় শেষে দুঃখ পেতে হয়। পরদিনের ছড়ানো উচ্ছিষ্ট, গলাবাতি এবং শুক্‌নো মালার দিকে তাকিয়ে মন উদাস হয়ে যায়—তখন আর চিত্তের রাজকীয় ঔদার্য্য থাকে না—হিসাবের কথাটা মনে পড়ে মন ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু দুঃখ পেতে হয় না তাকে যে প্রতিদিনই কিছু কিছু সম্বল জমিয়ে তোলে—প্রতিদিনই যে লোক উৎসবের আয়োজন করে চলেছে—যার উৎসব-দিনের সঙ্গে প্রতিদিনের সম্পূর্ণ পার্থক্য নেই, পরস্পর নাড়ির যোগ আছে।

এটি না হলেই আমাদের ঋণ করে উৎসব করতে হয়। আনন্দ করি বটে কিন্তু সে আনন্দের অধিকাংশই ঠিক নিজের কড়ি দিয়ে

করিনে—তার পনেরো আনাই ধারে চালাই। লোক-সমাগম থেকে ধার করি, ফুলের মালা থেকে, আলো থেকে, সভাসজ্জা থেকে ধার করি—গান থেকে, বাজনা থেকে, বক্তৃতা থেকে ধার নিই। সেদিনকার উত্তেজনায় চেতনাই থাকে না যে ধারে চালাচ্ছি—পরদিনে যখন ফুল শুকোয়, আলো নেবে, লোক চলে যায় তখন দেনার প্রকাণ্ড শূন্যতাটা চোখে পড়ে হৃদয়কে ব্যাকুল করে।

আমাদের এই দৈন্যবশতই উৎসবদেবতাকে আমরা উৎসবের সঙ্গে সঙ্গেই বিসর্জ্জন দিয়ে বসি—উৎসবের অধিপতিকে প্রতিদিনের সিংহাসনে বসাবার কোনো আয়োজন করিনে।

আমাদের সৌভাগ্য এই যে আমরা কয়জন প্রতিদিন প্রত্যুষে এই মন্দির প্রাঙ্গণে একত্রে মিলে কিছু কিছু জমাচ্ছিলুম—আমরা এই উৎসবের মেলায় একেবারেই অনাহূত বিদেশীর মত জুটিনি,—আমাদের প্রতিদিনের সকাল

বেলার সব কটিই হাতে হাতেই বাজে খরচ হয়ে যায় নি। আমরা উৎসবকর্ত্তাকে বোধ করি বল্‌তে পেরেছি যে তোমার সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় আছে, তোমায় নিমন্ত্রণ আমি পেয়েছি।

তার পরে আমাদের উৎসবকে হঠাৎ এক দিনেই সাঙ্গ করে দেব না—এই উৎসবকে আমাদের দৈনিক উৎসবের মধ্যে প্রবাহিত করে দেব। প্রতিদিন প্রাতঃকালেই আমাদের দশজনের এই উৎসব চল্‌তে থাক্‌বে। আমাদের প্রতিদিনের সমস্ত তুচ্ছতা এবং আত্মবিস্মৃতির মধ্যে অন্তত একবার করে দিনারম্ভে জগতের নিত্য উৎসবের ঐশ্বর্য্যকে উপলব্ধি করে যাবি। যখন প্রত্যহই উষা তাঁর আলোকটি হাতে করে পূর্ব্বদিকের প্রান্তে এসে দাঁড়াবেন তখন আমরা কয় জনেই স্তব্ধ হয়ে বসে অনুভব করব আমাদের প্রত্যেক দিনই মহিমান্বিত, ঐশ্বর্য্যময়, —আমাদের জীবনের তুচ্ছতা তাকে লেশমাত্র

মলিন করে নি—প্রতিদিনই. সে নবীন, সে উজ্জ্বল, সে পরমাশ্চর্য্য—তার হাতের অমৃত-পাত্র একেবারে উপুড় করে ঢেলেও তার এক বিন্দু ক্ষয় হয় না।

৯ই পৌষ

সঞ্চয়-তৃষ্ণা

একদিনের প্রয়োজনের বেশি যিনি সঞ্চয় করেন না আমাদের প্রাচীন সংহিতায় সেই দ্বিজ গৃহীকেই প্রশংসা করেছেন। কেন না একবার সঞ্চয় কর্তে আরম্ভ করলে ক্রমে আমরা সঞ্চয়ের কল হয়ে উঠি, তখন আমাদের সঞ্চয় প্রয়োজনকে বহুদূরে ছাড়িয়ে চলে যায়, এমন কি, প্রয়োজনকেই বঞ্চিত ও পীড়িত করতে থাকে।

আধ্যাত্মিক সঞ্চয় সম্বন্ধেও যে এ কথা খাটে না তা নয়। আমরা যদি কোনো পুণ্যকে মনে করি যে ভবিষ্যৎ কোনো একটা ফল-লাভের জন্যে তাকে জমাচ্ছি, তা হলে জমানো-টাই আমাদের পেয়ে বসে—তার সম্বন্ধে আমরা কৃপণের মত হয়ে উঠি—তার সম্বন্ধে আমাদের

স্বাভাবিকতা একেবারে চলে যায়; সব কথাতেই কেবল আমরা সুদের দিকে তাকাই, লাভের হিসাব করতে থাকি।

এমন অবস্থায় পুণ্য আমাদের আনন্দকে উপবাসী করে রাখে এবং মনে করে উপবাস করেই সেই পুণ্যের বৃদ্ধিলাভ হচ্ছে। এইরূপ আধ্যাত্মিক সাধনাক্ষেত্রেও অনেক কৃপণ আহারকে জমিয়ে তুলে প্রাণকে নষ্ট করে।

আধ্যাত্মিক গৃহস্থালিতে আমরা কালকের জন্যে আজকে ভাবব না। তা যদি করি তবে আজকেরটাকেই বঞ্চিত করব। আমরা জমানোর কথা চিন্তাই করব না, আমরা খরচই জানি। আমাদের প্রতিদিনের উপাসনা যেন আমাদের প্রতিদিনের নিঃশেষ সামগ্রী হয়। মনে করব না তার থেকে আমরা শান্তিলাভ করব, পুণ্যলাভ করব, ভবিষ্যতে কোনো একসময়ে পরিত্রাণলাভ করব, বা আর কিছু। যা কিছু সংগ্রহ হয়েছে তা হাতে হাতে সমস্তই

তাঁকে ঢেলে শেষ করে দিতে হবে; তাঁকেই সব দেওয়াতেই সেই দেওয়ার শেষ।

যদি আমরা মনে করি তাঁর উপাসনা করে আমার পুণ্য হচ্চে তাহলে সমস্ত পূজা ঈশ্বরকে দেওয়া হয় না পুণ্যের জন্যেই তার অনেকখানি জমানো হয়। যদি মনে করতে আরম্ভ করি ঈশ্বরের যে কাজ করচি তার থেকে লোকহিত হবে, তাহলে লোকহিতের উত্তেজনাটা ক্রমেই ঈশ্বরের প্রসাদলাভকে খর্ব্ব করে দিয়ে বেড়ে উঠ্‌তে থাকে।

ধর্ম্মব্যাপারে এই পাপের ছিদ্র দিয়েই বিষয় কর্ম্মের সাংসারিকতার চেয়ে তীব্রতর সাংসারিকতা প্রবেশলাভ করে। তার থেকেই ক্রোধ, বিদ্বেষ, পরনিন্দা, পরপীড়ন নিশাচরগণ ধর্ম্মের নামে তাদের গুহাগহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়ে—মতের সঙ্গে মতের যুদ্ধে পৃথিবী একেবারে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। তখন ঈশ্বরকে পিছনে ঠেলে রেখে আমরা এগিয়ে চল্‌তে

থাকি। আমরা হিত করব, আমরা পুণ্য করব, আমরা ঈশ্বরকে প্রচার করব এই কথাটাই ক্রমে ভীষণ হয়ে বেড়ে উঠ্‌তে থাকে —ঈশ্বর করবেন সে আর মনে থাকে না। তখন ঈশ্বরের ভৃত্যেরাই ঈশ্বরের পথ রোধ করে দাঁড়ায়,—কোথায় থাকে শান্তি, কোথায় থাকে হিত, কোথায় থাকে পুণ্য!

তাই আমার এক একবার ভয় হয় আমিও বা সকালবেলায় ক্রমে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরের কথা জমাবার ব্যবসা খুলেছি! তোমরা কি করলে বুঝবে, তোমাদের কি করলে ভাল লাগ্‌বে, কি করলে আমার কথা হিতকর হয়ে উঠবে এই ভাবনা ক্রমে বুঝি আমাকে পেয়ে বসে! তার ফল হবে এই যে, উপাসনার উপলক্ষ্যে এমন একটা কিছু জমানো চল্‌তে থাক্‌বে যার দিকে আমার বার আনা মন পড়ে থাক্‌বে—যদি কেউ বলে তোমার কথা ভাল বোঝা যাচ্চে না—বা তুমি ভাল

সাজিয়ে বল্‌তে পার নি তাহলে আমার রাগ হবে।

শুধু তাই নয়, আমার কথার দ্বারা অন্য লোকে ফল পাবে এই চিন্তা গুরুতর হয়ে উঠলে অন্য লোকের উপর জুলুম করবার প্রবৃত্তি ঘাড়ে চেপে বসে। যদি দেখি যে মনের মত ফল হচ্চে না তাহলে জবরদস্তি করতে ইচ্ছা করে, তখন, নিজের শক্তি ও অধিকারকে নয়, অন্যেরই বুদ্ধি ও স্বভাবকে ধিক্কার দিতে প্রবৃত্তি জন্মে। তখন আর মনের সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে বল্‌তে পারিনে যে ঈশ্বর তাঁর বহুধাশক্তিযোগে বিচিত্র উপায়ে বিচিত্র মানবের মঙ্গল করুন—তখন আমাদের অসহিষ্ণু উদ্যম এই কথাই বল্‌তে থাকে যে আমারই শক্তি, আমারই বাক্য, আমারই উপায়ে পৃথিবীর লোককে আমারই মতে বাধ্য করে তাদের ভাল করুক।

সেই জন্যে ঐ আমাদের প্রতিদিনের

উপাসনা থেকে এই যে কিছু কিছু করে কথা বাঁচাচ্ছি এ'কেই আমি ভয় করি। এই কথা আমার বোঝা না হোক্, আমার বন্ধন না হোক্, আমার পথের বাধা না হোক্! এই কথা সম্পূর্ণ ই তোমার সেবায় উৎসর্গীকৃত মনে করে যেন নিজ্ খাতে এর কোনো হিসাব না রাখি। এর যদি কোনো ফল থাকে তবে তুমি ফলাও—আমার মমতার নাড়ি বিচ্ছিন্ন করে এ যেন ভূমিষ্ঠ হয়। হে নীরব, এই প্রভাতের উপাসনার সমস্ত বাক্যকে তুমি গ্রহণের দ্বারাই সফল কর, আমার কণ্টকিত অহঙ্কারের বৃন্ত থেকে এ'কে একেবারে উৎপাটিত করে নাও!

১০ই পৌষ

পার কর

সেই যে সেদিন ভাঙামেলায় ভোর রাত্রে নানা হাসি-তামাসা-গোলমাল-তুচ্ছকথার মাঝ-খানে গান উঠ্‌ছিল—হরি আমায় পার কর—সে আমি ভুল্‌তে পার্‌ছিনে, সে আমাকে আজও বিস্মিত করচে।

এই যে কথাটা মানুষ এতদিন থেকে বলে আস্‌চে, আমায় পার কর, এটা একটা আশ্চর্য্য কথা। তার এই আকাজ্ক্ষাটা আপনাকে আপনি সম্পূর্ণ জানে কি না তাও বুঝ্‌তে পারি নে।

যদি কোনো সাধক সংসারের সমস্ত চেষ্টা ছেড়েছুড়ে দিয়ে তাঁর সাধন-সমুদ্রের কূলে এসে দাঁড়িয়ে বলেন, হে সিদ্ধিদাতা, তুমি আমাকে সিদ্ধির কূলে পার করে দাও তবে তার মানে বুঝতে পারি। কিন্তু যার সম্মুখে

কোনো উদ্দেশ্য নেই, কোনো সাধনা নেই— তার নাবিক কোথায়, তার সমুদ্র কোথায়, সে কী পার হতে চাচ্চে? তার এ-পারটাই বা কোথায় আর ও-পারটাই বা কোথায়?

আমরা আমাদের সমস্ত কাজকর্ম্মের ভিড়ের মাঝখানে থেকেই বলচি, হরি পার কর; গাড়োয়ান যখন গাড়ি চালাচ্চে, বল্‌চে পার কর; মুদী যখন চাল ডাল ওজন করচে, বল্‌চে পার কর!

মনে কোরো না তারা বল্‌চে আমাদের এই কর্ম্ম হতেই পার কর! তারা কর্ম্মের মধ্যে থেকেই পার হতে চাচ্চে সেই জন্যে গান গাবার সময় তাদের কাজ কামাই যাচ্চে না।

হে আনন্দসমুদ্র, এপারও তোমার ওপারও তোমার! কিন্তু একটা পারকে যখন আমার পার বলি তখন ওপারের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে। তখন সে আপনার সম্পূর্ণতার অনুভব হতে ভ্রষ্ট হয়, ওপারের জন্যে ভিতরে ভিতরে

কেবলই তার প্রাণ কাঁদ্‌তে থাকে। আমার পারের আমি, ঐ তোমার পারের তুমির বিরহে বিরহিনী। পার হবার জন্যে তাই এত ডাকাডাকি!

এইটে আমার ঘর বলে আমি-লোকটা দিনরাত্রি খেটে মরচে, যতক্ষণ না বল্‌তে পারচে এইটে তোমারও ঘর, ততক্ষণ তার যে কত দাহ, কত বন্ধন, কত ক্ষতি তার সীমা নেই— ততক্ষণ ঘরের কাজ করতে করতে তার অন্তরাত্মা কেঁদে গাইতে থাকে, হরি আমায় পার কর। যখনি সে আমার ঘরকে তোমারই ঘর করে তুল্‌তে পারে তখনি সে ঘরের মধ্যে থেকে পার হয়ে যায়। আমার কর্ম্ম মনে করে আমি-লোকটা রাত্রিদিন যখন হাঁসফাঁস করে বেড়ায়, তখন সে কত আঘাত পায় আর কত আঘাত করে, তখনি তার গান, আমায় পার কর—যখন সে বল্‌তে পারে, তোমার কর্ম্ম, তখন সে পার হয়ে গেছে।

আমার ঘরকে তোমার ঘর করব, আমার কর্ম্মকে তোমার কর্ম্ম করব তবেই ত আমাতে তোমাতে মিল হবে। আমার ঘর ছেড়ে তোমার ঘরে যাব, আমার কর্ম্ম ছেড়ে তোমার কর্ম্মে যাব একথা আমাদের প্রাণের কথা নয়। কেন না, এও যে বিচ্ছেদের কথা! যে-আমির মধ্যে তুমি নেই, আর যে-তুমির মধ্যে আমি নেই দুইই আমার পক্ষে সমান।

এই জন্যেই আমাদের ঘরের মাঝখানেই, আমাদের কাজকর্ম্মের হাটের মধ্যেই দিনরাত রব উঠছে, হরি আমায় পার কর। এই খানেই সমুদ্র, এই খানেই পার।

১১ই পৌষ

এপার ওপার

যার সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় আছে মাত্র সে আমার পাশে বসে থাকলেও তার আর আমার মাঝখানে একটি সমুদ্র পড়ে থাকে—সেটি হচ্ছে অচৈতন্যের সমুদ্র, ঔদাসীন্যের সমুদ্র। যদি কোনো দিন সেই লোক আমার প্রাণের বন্ধু হয়ে ওঠে তখনি সমুদ্র পার হয়ে যাই। তখন আকাশের ব্যবধান মিথ্যা হয়ে যায়, দেহের ব্যবধানও ব্যবধান থাকে না, এমন কি, মৃত্যুর ব্যবধানও অন্তরাল রচনা করে না। যে অহঙ্কার আমাদের পরস্পরের চারদিকে পাঁচিল তুলে পরস্পরকে অতি নিকটেও দূর করে রাখে—সে যার জন্যে পথ ছেড়ে দেয় সেই আমাদের আপন হয়ে ওঠে।

সেই জন্যে কাল বলেছিলুম সমুদ্র পার

হওয়া কোনো একটা সুদূরে পাড়ি দেবার ব্যাপার নয়, সে হচ্চে কাছের জিনিষকেই কাছের করে নেওয়া।

বস্তুত আমাদের যত কাছের জিনিষ যত দূরে রয়েছে তার দূরত্বটাও ততই ভয়ানক। এই কারণেই, আমরা আত্মীয়কে যখন পর করি তখন পরের চেয়ে তাকে বেশি পর করি। যার ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আছি তাকে যখন অনুভব-মাত্র করিনে তখন সেই অসাড়তা মৃত্যুর অসাড়তার চেয়ে অনেক বেশি।

এই কারণেই, জগতের সকলের চেয়ে যিনি অন্তরতম তাঁকেই যখন দূর বলে জানি তখন তিনি জগতের সকলের চেয়ে দূরে গিয়ে পড়েন—যিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ তিনি ঐ স্থূল দেয়ালের চেয়ে দূরে দাঁড়ান—সংসারে তখন এমন কোনো দূরত্ব নেই যার চেয়ে দূরে তিনি সরে না যান। এই দূরত্বের বেদনা আমরা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করিনে বটে কিন্তু

এই দূরত্বের ভারে আমাদের প্রতিদিনের অস্তিত্ব, আমাদের ঘরদুয়ার, কাজকর্ম, আমাদের সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

অথচ যে সমুদ্রপারের জন্যে আমরা কেঁদে বেড়াচ্ছি সে পারটা যে কত কাছে—এমন কি, এপারের চেয়েও যে সে কাছে, সে কথা, যাঁরা জানেন, তাঁরা অত্যন্ত স্পষ্ট করেই বলেছেন। শুনলে হঠাৎ আমাদের চমক লাগে—মনে হয় এত কাছের কথাকেও আমরা এতই দূর করে জেনেছিলুম! একেই বলেছিলুম অগম্য, অপার, অসাধ্য!

যাঁরা সমুদ্র পার হয়েচেন তাঁরা কি বলেন! তাঁরা বলেন, এষাস্য পরমাগতিঃ এষাস্য পরমা-সম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এষঃ মানে ইনি—এই সামনেই যিনি, এই কাছেই যিনি আছেন। অস্য মানে ইহার—সেও খুব নিকটের ইহার। ইনিই হচ্ছেন ইহার পরম গতি। যিনি যার পরম

গতি তিনি তার থেকে লেশমাত্র দূরে নেই। এতই কাছে যে তাঁকে ইনি বল্লেই হয়, তাঁর নাম করবারও দরকার নেই—"এই যে ইনি" বলা ছাড়া তাঁর আর কোনো পরিচয় দেবার প্রয়োজন হয় না। ইনিই হচ্ছেন ইহার সমস্তই! ইনি যে কে এবং ইহার যে কাহার সে আর বলাই হল না! সমুদ্রের এ পারে যে আছে সে ত ওপারের লোককে এষঃ বলে না, ইনি বলে না!

ইনিই হচ্চেন ইহার পরমাগতি। আমরা যে চলি, আমাদের চালায় কে? আমরা মনে করি টাকা আমাদের চালায়, খ্যাতি আমাদের চালায়, মানুষ আমাদের চালায়; যিনি পার হয়েছেন তিনি বলেন ইনিই ইহার গতি—এঁর টানেই এ চলেছে—টাকার টান, খ্যাতির টান, মানুষের টান, সব টানের মধ্যে পরম টান হচ্চে এর—সব টান যেতে পারে কিন্তু সে টান থেকেই যায়—কেন না সব যাওয়ার মধ্যেই

তাঁর কাছে যাওয়ার তাগিদ রয়েছে। টাকাও বলে না তুমি এই খানেই থেকে যাও, খ্যাতিও বলে না, মানুষও বলে না—সবাই বলে তুমি চল—যিনি পরমাগতি তিনিই গতি দিচ্চেন, আর কেউ যে পথের মধ্যে বরাবরের মত আটক করে রাখবে এমন সাধ্য আছে কার?

আমরা হয়ত মনে করতে পারি পৃথিবী যে আমাকে টান্‌চে সেটা পৃথিবীরই টান, কিন্তু তাই যদি হবে, পৃথিবীকে টানে কে? সূর্য্যকে কে আকর্ষণ করচে? এই যে বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের জোরে গ্রহতারা নক্ষত্রকে ঘোরাচ্চে, কাউকে নিশ্চল থাকৃতে দিচ্চে না। সেই বিরাট কেন্দ্রাকর্ষণের কেন্দ্র ত পৃথিবীতে নেই। একটি পরমাগতি আছে, যা আমারও গতি, পৃথিবীরও গতি, সূর্য্যেরও গতি।

এই পরমাগতির কথা স্মরণ করেই উপনিষৎ বলেছেন "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ

যদেষ আকাশ আনন্দো নঃ স্যাৎ”—কেই বা কোনো প্রকারের কিছুমাত্র চেষ্টা করত যদি আকাশ পরিপূর্ণ করে সেই আনন্দ না থাকতেন। সেই আনন্দই বিশ্বকে অনন্তগতি দান করে রয়েছেন—আকাশপূর্ণ সেই আনন্দ আছেন বলেই আমার চোখের পাতাটি আমি খুলতে পারচি।

তাই আমি বলচি, আমার পরমাগতি দূরে নেই, আমার সকল তুচ্ছ গতির মধ্যেই সেই পরমাগতি আছেন। যেমন আপেল ফলটি মাটিতে পড়ার মধ্যেই বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রাকর্ষণ-শক্তি আছে। আমার শরীরের সকল চলা এবং আমার মনের সকল চেষ্টার যিনি পরমা গতি, তিনি হচ্চেন এষঃ, এই ইনি। সেই গতির কেন্দ্র দূরে নয়—এই যে এই খানেই!

তার পরে যিনি আমাদের পরম সম্পৎ, আমাদের পরম আশ্রয়, আমাদের পরম আনন্দ —তিনি আমাদের প্রতিদিনের সমস্ত সম্পদ,

প্রতিদিনের সমস্ত আশ্রয় এবং প্রতিদিনের সমস্ত আনন্দের মধ্যেই রয়েছেন। আমাদের ধনজন, আমাদের ঘর দুয়ার, আমাদের সমস্ত রসভোগের মধ্যেই যিনি পরমরূপে রয়েছেন তিনি যে এষঃ—তিনি যে ইনি—এই যে এই খানেই।

আমার সমস্ত গতিতে সেই পরমগতিকে, আমার সমস্ত সম্পদে সেই পরম সম্পদকে, আমার সমস্ত আশ্রয়ে সেই পরম আশ্রয়কে আমার সমস্ত আনন্দেই সেই পরম আনন্দকে এষঃ বলে জানব—একেই বলে পার হওয়া।

১২ই পৌষ

শান্তিনিকেতন
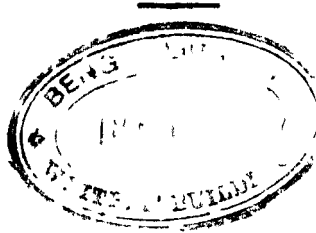
(তৃতীয়)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ।০ আনা

প্রকাশক—
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস্
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস
২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

শান্তি নিকেতন

দিন

প্রতিদিনই আলোক এবং অন্ধকার, নিদ্রা এবং জাগরণ, সঙ্কোচন এবং প্রসারণের মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন চলেছে—একবার তার জোয়ার একবার তার ভাঁটা। রাত্রে নিদ্রার সময় আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়-মনের শক্তি আমাদের নিজের মধ্যেই সংহৃত হয়ে আসে। সকাল বেলায় সমস্ত জগতের দিকে ধাবিত হয়।

শক্তি যখন কেবল আমাদের নিজের মধ্যে সমাহৃত হয় সেই সময়েই কি আমরা নিজেকে বেশি করে জানি, বেশি করে পাই?

আর সকালে যখন আমাদের শক্তি অন্যের দিকে নানা পথে বিকীর্ণ হতে থাকে তখনি কি আমরা নিজেকে হারাই ?

ঠিক তার উল্টো। কেবল নিজের মধ্যে যখন আমরা আসি তখন আমরা অচেতন, যখন সকলের দিকে যাই তখন আমরা জাগ্রত, তখনি আমরা নিজেকে জানি। যখন আমরা একা তখন আমরা কেউ নই।

আমাদের যথার্থ তাৎপর্য্য আমাদের নিজেদের মধ্যে নেই, তা জগতের সমস্তের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে—সেই জন্যে আমরা বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, কর্ম্ম দিয়ে কেবলি সমস্তকে খুঁজচি, কেবলি সমস্তের সঙ্গে যুক্ত হতে চাচ্চি নইলে যে নিজেকে পাইনে। আত্মাকে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করব এই হচ্চে আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

আপেল ফলের পতন-শক্তিকে যখন জ্ঞানী বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যেই দর্শন করলেন

তখন তাঁর বুদ্ধি অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হল। কারণ, সত্যকে সর্ব্বত্র দেখলেই তার সত্যমূর্ত্তি প্রকাশ পায় এবং সেই মূর্ত্তিই আমাদের আনন্দ দান করে।

তেমনি আমরা আমাদের নিজেকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত দেখ্‌ব এই হলেই নিজেকে সত্যরূপে দেখা হয়। নিজের এই সত্যকে যতই ব্যাপক করে জানব ততই আমাদের আনন্দ হবে। যে কেউ আমাদের আপনাকে তার নিজের ভিতর থেকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে তাকে আমাদের কাছে সত্যতররূপে প্রকাশ করে তাকেই আমরা আত্মীয় বলি, সেই আমাদের আনন্দ দেয়।

এই কারণেই মানবাত্মা বহু প্রাচীন যুগ হতে গৃহ বল, সমাজ বল, রাজ্য বল, যা কিছু সৃষ্টি করচে তার ভিতরকার একটি মাত্র মূল তাৎপর্য্য এই যে, মানুষ একাকিত্ব পরিহার করে বহুর মধ্যে বিচিত্রের মধ্যে আপনার নানা

শক্তিকে নানা সম্বন্ধে বিস্তৃত করে দিয়ে নিজেকে বৃহৎক্ষেত্রে উপলব্ধি করবে—এই তার যথার্থ সুখ। এই জন্তেই বলা হয়েছে ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি—ভূমাই সুখ অল্পে সুখ নেই। তার কারণ, অল্পে আত্মাও অল্প হয়।

যে সমাজ সভ্য সেই সমাজ বহুকে বিচিত্র-ভাবে আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে বলেই সে সমাজের গৌরব। নইলে কেবল উপকরণ-বাহুল্য এবং সুবিধার সমাবেশ তার সার্থকতা নয়।

সভ্যসমাজে যেখানে জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্ম-চেষ্টা নিয়ত দূরপ্রসারিত ক্ষেত্রে সর্ব্বদাই সচেষ্ট হয়ে আছে সেইখানে যে-মানুষ বাস করে সে ক্ষুদ্র হয়ে থাকে না। সে ব্যক্তির শক্তি অল্প হলেও সে শক্তি সহজেই নিজেকে সার্থক করবার অবকাশ পায়। এই জন্তেই সকলের যোগে ভূমার যোগে সভ্যসমাজবাসী প্রত্যেকেই যথাসম্ভব বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

যে সমাজ সভ্য নয় সে সমাজে স্বভাব-বলিষ্ঠ লোকও দুর্ব্বল হয়ে থাকে কারণ সে সমাজের লোকেরা আপনাকে যথেষ্ট পরিমাণে পায় না। সে সমাজে যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে সে কেবল ঘরের উপযোগী গ্রামের উপযোগী, ভূমার সঙ্গে সে সকল সঙ্কীর্ণ প্রতিষ্ঠানের যোগ নেই—সেখানে চিত্তসমুদ্রের জোয়ার এসে পৌঁছয় না; এই জন্যে সেখানে মানুষ নিজের সত্য নিজের গৌরব অনুভব করে' শক্তিলাভ করতে পারে না, সে সর্ব্বত্র পরাভূত হয়ে থাকে। তার দারিদ্র্যের অন্ত থাকে না।

এই জন্যেই আমাদের সভ্যতার সাধনা করতে হবে, রেলোয়ে টেলিগ্রাফের জন্যে নয়। কারণ, রেলোয়ে টেলিগ্রাফেরও শেষ গম্যস্থান হচ্ছে মানুষ—কোনো স্থানীয় ইষ্টেসন বিশেষ নয়।

এই সভ্যতা-সাধনার গোড়াকার কথাই

হচ্চে ধর্ম্মবুদ্ধি। যতই আপনার প্রসার অল্প হয় ততই ধর্ম্মবুদ্ধি অল্প হলেও চলে। নিজের ঘরে সঙ্কীর্ণ জায়গায় যখন কাজ করি তখন ধর্ম্মবুদ্ধি সঙ্কীর্ণ হলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু যেখানে বহুলোককে বহুবন্ধনে বাঁধতে হয় সেখানে ধর্ম্মবুদ্ধি প্রবল হওয়া চাই। সেখানে ধৈর্য্যবীর্য্য অধ্যবসায় ত্যাগ সেবাপরতা লোকহিতৈষা সমস্তই খুব বড় রকমের না হলে নয়। বস্তু কোনো মতেই বৃহৎ হয়ে উঠ্‌তে পারে না যদি তাকে ধরে রাখবার উপযোগী ধর্ম্মও বৃহৎ না হয়—ধর্ম্ম যখনি দুর্ব্বল হয় তখনি বৃহৎ সমাজ বিশ্লিষ্ট হয়ে ভেঙে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে—কখনই কেউ তাকে বাঁধতে পারে না।

অতএব যখনি বহুব্যাপারবিশিষ্ট বহুদূরব্যাপ্ত বহুশক্তিশালী কোনো সভ্যসমাজকে দেখব তখনি গোড়াতেই ধরে নিতে হবে তার ভিতরে একটি প্রবল ধর্ম্মবুদ্ধি আছে

—নইলে এতলোকে পরস্পরে নিশ্বাস পরস্পরে যোগ, এক মুহূর্ত্তও থাক্‌তে পারে না।

আমাদের দেশের সমাজেও সমস্ত ক্ষুদ্রতা বিচ্ছিন্নতা দূর করে জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে ভূমার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে মানবাত্মা কখনই বলিষ্ঠ এবং আনন্দিত হতে পারবে না। সাধারণের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ যতই নানা প্রকার আচারে বিচারে বাধা প্রাপ্ত হতে থাক্‌বে ততই আমাদের নিরানন্দ, অক্ষমতা ও দারিদ্র্য কেবলি বেড়ে চল্‌বে। আমাদের দেশে বহুর সঙ্গে ঐক্যযোগের নানা সুযোগ রচনা করতে না পারলে আমাদের মহত্বের তপস্যা চল্‌বে না।

সেই সুযোগ রচনা করবার জন্যে আমরা নানাদিক থেকে চেষ্টা করচি। কিন্তু ছোট-বড় আমরা যা কিছু বেঁধে তুলতে চাচ্চি তার মধ্যে যদি কেবলি বিশ্লিষ্টতা এসে পড়চে

এইটেই দেখা যায় তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে গোড়ায় ধর্ম্মবুদ্ধির দুর্ব্বলতা আছে—নিশ্চয়ই সত্যের অভাব আছে, ত্যাগের কার্পণ্য আছে, ইচ্ছার জড়তা আছে; নিশ্চয়ই শ্রদ্ধায় বল নেই এবং পূজার উপকরণ থেকে আমাদের আত্মাভিমান নিজের জন্য বৃহৎ অংশ চুরি করবার চেষ্টা করচে; নিশ্চয়ই পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা রয়েছে, ক্ষমা নেই; এবং মঙ্গলকেই মঙ্গলের চরম ফলরূপে গণ্য করতে না পারাতে আমাদের অধ্যবসায় ক্ষুদ্র বাধাতেই নিরস্ত হয়ে যাচ্চে।

অতএব আমাদের সতর্ক হতে হবে। যেখানে কৃতকার্য্যতার বাধা ঘটবে সেখানে নির্ব্বাক্ উপকরণের প্রতি দোষারোপ করে যেন নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা না করি। পাপ আছে তাই বাঁধ্‌চে না, ধর্ম্মের অভাব আছে তাই কিছুই ধরা যাচ্চে না। এই জন্যেই আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষুদ্র হয়ে সর্ব্ববিষয়েই

নিষ্ফল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্চি—এই জন্যেই আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, প্রাণের সঙ্গে প্রাণ, চেষ্টার সঙ্গে চেষ্টা সম্মিলিত হয়ে মানবাত্মার উপযুক্ত বিহারক্ষেত্র নির্ম্মাণ করচে না—আমাদের আত্মা কোনোমতেই সেই বিশ্বকর্ম্মা বিরাট্ পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হবার যোগ্য নিজের বিরাট্‌রূপ ধারণ করতে পারচে না।

১৩ই পৌষ।

—

রাত্রি

গতকল্য রাত্রি এবং দিন, নিদ্রা এবং জাগরণের একটি কথা বলা হয় নি। সেটাই হচ্চে প্রধান কথা।

যখন আমরা জাগ্রত থাকি তখন আমাদের শক্তির সঙ্গে শক্তির লীলা ঘটে। বিশ্বকর্ম্মার বিশ্বকর্ম্মের সঙ্গে আমাদের কর্ম্মের যোগসাধন হয়। যিনি "বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি"—তাঁরই সেই বহুবিভক্ত শক্তির বিচিত্র প্রবাহ-পথে আমাদের চেষ্টাকে চালন করে আমরা শক্তির আশ্চর্য্য গতি সকল আবিষ্কার করে আনন্দিত হই। এক সময়ে যেখানে মনে করেছিলুম শক্তির শেষ, চল্‌তে গিয়ে দেখতে পাই সেখান থেকে পথ আবার একটা নূতন বাঁক নিয়েছে;—এমনি করে

জগদ্ব্যাপারের সেই বহুধাশক্তির মধ্যে নিজের শক্তিকেও বহুধা করে দিয়ে তার সঙ্গে সকল দিকে সমান গতিলাভ করবার জন্যে আমাদের চিত্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

এমনি করে আমাদের জাগ্রত চৈতন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি ও মানসশক্তির জালকে চতুর্দিকে নিক্ষেপ করে' 'নানা বেগ, নানা স্পর্শ, নানা লাভের দ্বারা নিজেকে সার্থক করে।

কিন্তু কেবলি জাল বাইচ্ করে ত জেলের চলে না। জালে গ্রন্থি পড়ে, জাল ছিঁড়ে আসে, জাল মলিন হয়। তখন আবার সে-গুলো সংশোধন করে নেবার জন্যে জাল-বাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিতে হয়।

রাত্রে নিদ্রার সময় আমরা প্রাণের জাল-বাওয়া, চেতনার জাল-বাওয়া, একেবারে বন্ধ করে দিই। তখন সংশোধন ও ক্ষতি-পূরণের সময়। তখন আমাদের ছিন্ন ভিন্ন গ্রন্থিল মলিন জালটিকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে

দিতে হয় "য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ" যে পুরুষ, সকলে যখন সুপ্ত তখন জাগ্রত থেকে, প্রয়োজনসকলকে নির্ম্মাণ করচেন।

অতএব একবার করে নিজের সমস্ত চেষ্টাকে সম্বরণ করে সম্পূর্ণভাবে সেই বিশ্ব-প্রাণের হাতে আমাদের প্রাণকে সমর্পণ করে দিতে হয়—সেই সময়ে আমরা গাছপালার সমান হয়ে যাই, প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের কোনো বিচ্ছেদ থাকে না, আমাদের অহঙ্কারের একেবারে নিবৃত্তি হয়, তখনই আমরা নিখিলের অন্তর্ব্বর্ত্তী যে গভীর আরাম তাকেই লাভ করি। জেগে উঠে বুঝ্‌তে পারি যে, বিশ্রামকে আমরা এতক্ষণ কেবলমাত্র শূন্যতারূপে পাইনি, তা একটা পূর্ণ বস্তু, আমাদের নিশ্চেষ্টতা নিশ্চৈতন্যের মধ্যেও সে একটা আরাম—সেটা হচ্চে বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির মূলগত আরাম—যে আরামের শ্যামল মূর্ত্তি ও নির্ব্বাক্ প্রকাশ

আমরা শাখাপল্লবিত নিস্তব্ধ বনস্পতির মধ্যে দেখতে পাই।

এই যেমন আমাদের প্রাণকে প্রতি রাত্রে প্রকৃতির হাতে সমর্পণ করে দিয়ে আমরা প্রভাতে নূতন প্রাণচেষ্টার জন্যে পুনরায় প্রস্তুত হয়ে উঠি—তেমনি দিনের মধ্যে অন্তত একবার করে আমাদের আত্মাকে পরমাত্মার হাতে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দেবার প্রয়োজন আছে—নইলে আবর্জ্জনা জমে ওঠে, ভাঙা-চোরাগুলো সারে না, তাপ বাড়তেই থাকে—কামক্রোধ লোভ প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলো তাদের প্রয়োজনকে অতিক্রম করে' অন্তরে বাহিরে বিদ্রোহ রচনা করে।

সেইজন্যে প্রভাতে উপাসনার সময়ে আমাদের সকল চেষ্টাকে ক্ষান্ত করে সব রিপুকে শান্ত করে কিছুকালের জন্যে পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের আপনার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন করে নেওয়া দরকার—সেই সময়ে আমাদের

অন্তরের মধ্যে পরমাত্মাকে সম্পূর্ণ পথ ছেড়ে দিতে হবে ;—তাহলে সেই একান্ত আত্ম-বিসর্জ্জনের সুগভীর শান্তির সুযোগে আমাদের মনের ব্যাধির মধ্যে স্বাস্থ্যের সঞ্চার হবে, সমস্ত সঙ্কোচন প্রসারিত হয়ে যাবে এবং হৃদয়-গ্রন্থিগুলি শিথিল হয়ে আস্‌বে।

তার পরে উপাসনাশান্ত সেই আমাদের অন্তরপ্রকৃতি যখন সংসারে বিচিত্রের মধ্যে, বহুর মধ্যে বিভক্ত হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে নানা আকারে প্রকারে আত্মোপলব্ধিতে প্রবৃত্ত হবে তখন সকল কাজে সে গম্ভীরভাবে পবিত্রভাবে নিযুক্ত হতে পারবে, তখন কথায় কথায় চতুর্দ্দিককে সে আঘাত দিতে থাক্‌বে না, তখন তার সমস্ত চেষ্টার মধ্যে শান্তি থাক্‌বে। বিশাল বিশ্বের বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে যেমন একটি আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য আছে, যেটি থাকাতে সমস্ত চেষ্টার মূর্ত্তি শান্ত ও শক্তির মূর্ত্তি সুন্দর হয়ে উঠেছে—যেটি

থাকাতে বিশ্বজগৎ একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-শালা অথবা প্রকাণ্ড কারখানাঘরের মত কঠোর আকার ধারণ করে নি—আমাদের চেষ্টার মধ্যে সেই সামঞ্জস্য থাক্‌বে, আমাদের কর্ম্মের মধ্যে সেই সৌন্দর্য্য ফুটে উঠবে। ঈশ্বর যেমন করে কাজ করেন, কিছুক্ষণ তাঁর কাছে আমাদের সমস্ত অহঙ্কারটি নিবৃত্ত করে দিয়ে তাঁর সেই পরম সুন্দর কৌশলটি শিখে নেব। আপনাকে তাঁর চরণপ্রান্তে উপস্থিত করে দিয়ে বল্‌ব, জননি, প্রাতঃকালে এর উপরে তোমার নিপুণ হস্তটি একবার স্পর্শ করে দাও—তাহলে গত কল্যকার সংসারের আঘাতে এর উপরে যে সকল ছিন্নতা এসেছে তা সমস্তই সেরে যাবে।

আমরা যদি প্রতিদিন দিবসারম্ভে তাঁর পবিত্র হস্তের স্পর্শ ললাটে গ্রহণ করে নিয়ে যাই এবং সে কথা যদি স্মরণ রাখি তবে ললাটকে আর ধূলিতে লুণ্ঠিত করতে পারব না। এই

উপাসনার সুরটি যেন তানপুরার সুরের মত আমাদের মধ্যে সমস্তদিন নিয়তই বাজ্‌তে থাকে —যাতে আমরা আমাদের প্রত্যেক কথাটি এবং ব্যবহারটিকে সেই সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বিচার করতে পারি এবং সমস্ত দিনকে বিশুদ্ধ সঙ্গীতে পরিণত করে সংসারের কর্ম্ম-ক্ষেত্রকে আনন্দক্ষেত্র করে তুল্‌তে পারি।

১৪ই পৌষ।

প্রভাতে

প্রভাতের এই পবিত্র প্রশান্ত মুহূর্তে নিজের আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে একবার সম্পূর্ণ সমাবৃত করে দেখ—সমস্ত ব্যবধান দূর হয়ে যাক্। নিমগ্ন হয়ে যাই, নিবিষ্ট হয়ে যাই, তিনি নিবিড় ভাবে আমাদের আত্মাকে গ্রহণ করেছেন এই উপলব্ধি দ্বারা একান্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠি।

নইলে আমাদের আপনার সত্য পরিচয় হয় না। ভূমার সঙ্গে যোগযুক্ত করে না দেখলে নিজেকে ক্ষুদ্র বলে ভ্রম হয়, নিজেকে দুর্ব্বল বলে মিথ্যা ধারণা হয়। আমি যে কিছুমাত্র ক্ষুদ্র নই, অশক্ত নই, মানবসমাজে মহাপুরুষেরা তার প্রমাণ দিয়েছেন—তাঁদের যে সিদ্ধি সে আমাদের প্রত্যেকের সিদ্ধি—আমাদের প্রত্যেক

আত্মার শক্তি তাঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়েছে। বাতির ঊর্দ্ধভাগ যখন আলোকশিখা লাভ করেছে তখন সে লাভ সমস্ত বাতির—বাতির নিতান্ত নিম্ন ভাগেও সেই জ্বলবার ক্ষমতা রয়েছে—যখন সময় হবে সেও জ্বল্‌বে—যখন সময় না হবে তখন সে উপরের জ্বলন্ত অংশকে ধারণ করে থাক্‌বে। প্রতিদিন, প্রভাতের উপাসনায় নিজের ভিতরকার মানবাত্মার সেই মাহাত্ম্যকে আমরা যেন একেবারে বাধামুক্ত করে দেখে নিতে পারি। নিজেকে দীন দরিদ্র বলে আমাদের যে ভ্রম আছে সেই ভ্রম যেন দূর করে যেতে পারি। আমরা যে কেবল ঘরের কোণে জন্মলাভ করেছি বলে একটা সংস্কার নিয়ে বসে আছি সেটা যেন ত্যাগ করে স্পষ্ট অনুভব করি ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকে আমার এই শরীরের জন্ম—সেই জন্যে বহুলক্ষ যোজন দূর পথ হতে আমাদের জ্যোতিষ্ক কুটুম্বগণ আমাদের তত্ত্ব নেবার জন্যে আলোকের দূত পাঠিয়ে

দিচ্ছেন। আর আমার অহঙ্কারটুকুর মধ্যেই যে আমার আত্মার চরম আবাস তা নয়—যে অধ্যাত্মলোকে তার স্থিতি সে হচ্চে ব্রহ্মলোক। যে জগৎ সভায় আমরা এসেছি এখানে রাজত্ব করবার আমাদের অধিকার, এখানে আমরা দাসত্ব করতে আসিনি। যিনি ভূমা তিনি স্বয়ং আমাদের ললাটে রাজটীকা পরিয়ে পাঠিয়েছেন। অতএব আমরা যেন নিজেকে অকুলীন বলে মাথা হেঁট করে সঙ্কুচিত হয়ে সংসারে সঞ্চরণ না করি—নিজের অনন্ত আভিজাত্যের গৌরবে নিজের উচ্চ স্থানটি যেন গ্রহণ করতে পারি।

আকাশের অন্ধকার যেমন নিতান্ত কাল্পনিক পদার্থের মত দেখতে দেখতে কেটে গেল —আমাদের অন্তরপ্রকৃতির চারদিক থেকে সমস্ত মিথ্যা সংস্কার তেমনি করে মুহূর্ত্তে কেটে যাক্। আমাদের আত্মা উদয়োন্মুখ সূর্য্যের মত আমাদের চিত্তগগনে তার বাধামুক্ত জ্যোতির্ম্ময়

স্বরূপে প্রকাশ পাক—তাঁর উজ্জ্বল চৈতন্যে তাঁর নির্ম্মল আলোকে আমাদের সংসারক্ষেত্র সর্ব্বত্র পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হোক।

১৫ই পৌষ

বিশেষ

জগতের সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে সাধারণভাবে আমার মিল আছে—ধূলির সঙ্গে পাথরের সঙ্গে আমার মিল আছে, ঘাসের সঙ্গে গাছের সঙ্গে আমার মিল আছে; পশুপক্ষীর সঙ্গে আমার মিল আছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার মিল আছে; কিন্তু এক জায়গায় একেবারে মিল নেই—যেখানে আমি হচ্চি বিশেষ। আমি যাকে আজ আমি বলচি এর আর কোনো দ্বিতীয় নেই। ঈশ্বরের অনন্ত বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে এ সৃষ্টি সম্পূর্ণ অপূর্ব্ব—এ কেবলমাত্র আমি, একলা আমি, অনুপম অতুলনীয় আমি। এই আমির যে জগৎ সে একলা আমারই জগৎ—সেই মহা বিজনলোকে আমার অন্তর্যামী ছাড়া আর কারো প্রবেশ করবার কোনো জো নেই।

হে আমার প্রভু, সেই যে একলা আমি, বিশেষ আমি, তার মধ্যে তোমার বিশেষ

আনন্দ, বিশেষ আবির্ভাব আছে—সেই বিশেষ আবির্ভাবটি আর কোনো দেশে কোনো কালে নেই। আমার সেই বিশিষ্টতাকে আমি সার্থক করব প্রভু। আমি নামক তোমার সকল হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই যে একটি বিশেষ লীলা আছে, এই বিশেষ লীলায় তোমার সঙ্গে যোগ দেব। এইখানে একের সঙ্গে এক হয়ে মিলব।

পৃথিবীর ক্ষেত্রে আমার এই মানবজন্ম তোমার সেই বিশেষ লীলাটিকে যেন সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গীতের সঙ্গে পবিত্রতার সঙ্গে মহত্বের সঙ্গে সচেতনভাবে বহন করে নিয়ে যায়। আমাতে তোমার যে একটি বিশেষ অধিষ্ঠান আছে সে কথা যেন কোনোদিন কোনোমতেই না ভোলে। অনন্ত বিশ্বসংসারে এই যে একটি আমি হয়েছি মানবজীবনে এই আমি সার্থক হোক।

এই আমিটিকে আর সকল হতে স্বতন্ত্র করে অনাদিকাল থেকে তুমি বহন করে

আন্‌চো। সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারার মধ্যে দিয়ে এ'কে হাতে ধরে নিয়ে এসেচ কিন্তু কারো সঙ্গে এ'কে জড়িয়ে ফেলনি। কোন্ নীহারিকার জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পনির্ঝর থেকে অণুপরমাণুকে চালন করে কত পুষ্টি, কত পরিবর্ত্তন, কত পরিণতির মধ্যে দিয়ে এই আমিকে আজ এই শরীরে ফুটিয়ে তুলেছ! তোমার সেই অনাদি-কালের সঙ্গ আমার এই দেহটির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। অনাদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত অনন্ত সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে একটি বিশেষ রেখাপাত হয়ে এসেছে সেটি হচ্চে এই আমির রেখা—সেই রেখাপথে তোমার সঙ্গে আমি বরাবর চলে এসেছি। সেই তুমি আমার অনাদি পথের চালক, অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু তোমাকে আমার সেই একলা বন্ধুরূপে আমার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করব। আর কোনো কিছুই তোমার সমান না হোক্, তোমার চেয়ে বড় না হোক্। আর আমার

এই যে সাধারণ জীবন যা নানা ক্ষুধাতৃষ্ণা চিন্তাচেষ্টা দ্বারা আমি সমস্ত তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে একত্রে মিলে ভোগ করচি সেইটেই নানাদিক দিয়ে প্রবল হয়ে না ওঠে, আমাতে তোমার যে একটি বিশেষ স্পর্শ, বিশেষ ক্রিয়া, বিশেষ আনন্দ অনন্তকালের সুহৃদ্‌ ও সারথি-রূপে রয়েছে তাকে যেন আচ্ছন্ন করে না দাঁড়ায়। আমি যেখানে জগতের সামিল সেখানে তোমাকে জগদীশ্বর বলে মানি, তোমার সব নিয়ম পালন করবার চেষ্টা করি, না পালন করলে তোমার শাস্তি গ্রহণ করি—কিন্তু আমিরূপে তোমাকে আমি আমার একমাত্র বলে জান্‌তে চাই। সেইখানে তুমি আমাকে স্বাধীন করে দিয়েছ—কেননা স্বাধীন না হলে প্রেম সার্থক হবে না, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিল্‌বে না, লীলার সঙ্গে লীলার যোগ হতে পারবে না। এইজন্যে এই স্বাধীনতার আমি-ক্ষেত্রেই আমার সব দুঃখের চেয়ে পরম

দুঃখ তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ অর্থাৎ অহঙ্কারের দুঃখ, আর, সব সুখের চেয়ে পরম সুখ তোমার সঙ্গে মিলন, অর্থাৎ প্রেমের সুখ। এই অহঙ্কারের দুঃখ কেমন করে ঘুচবে সেই ভেবেই বুদ্ধ তপস্যা করেছিলেন এবং এই অহঙ্কারের দুঃখ কেমন করে ঘোচে সেই জানিয়েই খৃষ্ট প্রাণ দিয়েছিলেন। হে পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতে প্রিয়, হে অন্তরতম প্রিয়তম, এই আমি-নিকেতনেই যে তোমার চরমলীলা। সেই জন্যেই ত এইখানেই এত নিদারুণ দুঃখ এবং সে দুঃখের এমন অপরিসীম অবসান—সেই জন্যই ত এইখানেই মৃত্যু—এবং অমৃত সেই মৃত্যুর বক্ষ বিদীর্ণ করে উৎসারিত হচ্চে। এই দুঃখ ও সুখ, বিচ্ছেদ ও মিলন, অমৃত ও মৃত্যু, এই তোমার দক্ষিণ ও বাম দুই বাহু, এর মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা দিয়ে যেন বলতে পারি, আমার সব মিটেচে, আমি আর কিছুই চাইনে!

১৬ই পৌষ, ১৩১৫

প্রেমের অধিকার

কাল রাত্রে এই গান্‌টা আমার মনের মধ্যে বাজ্‌ছিল—

"নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও!
মাঝে কিছু রেখোনা, থেকোনা দূরে।
নির্জ্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে নিত্য
তোমারে হেরিব,
সব বাধা ভাঙিয়া দাও!"

কিন্তু এ কেমন প্রার্থনা? এ প্রেম কার সঙ্গে? মানুষ কেমন করে একথা কল্পনাতে এনেছে এবং মুখে উচ্চারণ করেছে যে বিশ্ব-ভুবনেশ্বরের সঙ্গে তার প্রেম হবে?

বিশ্বভুবন বল্‌তে কতখানি বোঝায় এবং তার তুলনায় একজন মানুষ যে কত ক্ষুদ্র সে কথা মনে করলে যে মুখ দিয়ে কথা সরে না। সমস্ত মানুষের মধ্যে আমি ক্ষুদ্র, আমার সুখ-দুঃখ কতই অকিঞ্চিৎকর! সৌরজগতের মধ্যে

সেই মানুষ এক মুষ্টি বালুকার মত যৎসামান্য— এবং সমস্ত নক্ষত্রলোকের মধ্যে এই সৌর-জগতের স্থান এত ছোট যে অঙ্কের দ্বারা তার গণনা করা দুঃসাধ্য।

সেই সমস্ত অগণ্য অপরিচিত লোক-লোকান্তরের অধিবাসী এই মুহূর্ত্তেই সেই বিশ্বেশ্বরের মহারাজ্যে তাদের অভাবনীয় জীবনযাত্রা বহন করচে। এমন সকল জ্যোতিষ্ক-লোক অনন্ত আকাশের গভীরতার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে রয়েছে যার আলোক যুগযুগান্তর হতে অবিশ্রাম যাত্রা করে আজও আমাদের দূরবীক্ষণ ক্ষেত্রে এসে প্রবেশ করেনি। সেই সমস্ত অজ্ঞাত অদৃশ্য লোকও সেই পরমপুরুষের পরমশক্তির উপরে প্রতিমুহূর্ত্তেই একান্ত নির্ভর করে রয়েছে, আমরা তার কিছুই জানিনে।

এমন যে অচিন্তনীয় ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর— তাঁরই সঙ্গে এই কণার কণা, অণুর অণু, বলে কিনা প্রেম করবে? অর্থাৎ, তাঁর রাজ-

সিংহাসনে তাঁর পাশে গিয়ে বস্‌বে? অনন্ত আকাশে নক্ষত্রে নক্ষত্রে তাঁর জগৎযজ্ঞের হোমহুতাশন যুগযুগান্তর জ্বল্‌চে আমি সেই যজ্ঞক্ষেত্রের অসীম জনতার একটি প্রান্তে দাঁড়িয়ে কোন্ দাবীর জোরে দ্বারীকে বল্‌চি এই যজ্ঞেশ্বরের এক শয্যায় আমাকে আসন দিতে হবে?

বড় হয়ে ওঠবার জন্যে মানুষের আকাঙ্ক্ষার সীমা নেই একথা জানা কথা। শুনেছি না কি আলেক্‌জাণ্ডার এম্‌নি ভাবে কথা বলেছিলেন যে একটা পৃথিবী জয় করে তাঁর সুখ হচ্চে না, আর একটা পৃথিবী যদি থাক্‌ত তবে তিনি জয়যাত্রায় বেরতেন। দুবেলা যার অন্ন জোটেনা সেও কুবেরের ভাণ্ডারের স্বপ্ন দেখে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা যে কোনো কল্পনাকেই অসম্ভব বলে মানে না এমন প্রমাণ অনেক আছে।

মানুষ জগদীশ্বরের সঙ্গে প্রেম করতে চায় এও কি তার সেই অত্যাকাঙ্ক্ষারই একটা

চরম উন্মত্ততা? তার অহঙ্কারেরই একটা অশান্ত পরিচয়?

কিন্তু এর মধ্যে ত অহঙ্কারের লক্ষণ নেই। তার প্রেমের জন্যে যে লোক ক্ষেপেছে—সে যে নিজেকে দীন করে—সকলের পিছনে সে যে দাঁড়ায় এবং যাঁরা ঈশ্বরের প্রেমের দরবারের দরবারী তাঁদের পায়ের ধুলো পেলেও সে যে বাঁচে! কোনো ক্ষমতা কোনো ঐশ্বর্য্যের কাঙাল সে নয়—সমস্তই সে যে ত্যাগ করবার জন্যেই প্রস্তুত হয়েছে।

সেই জন্যেই জগৎসৃষ্টির মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য বলে আমার মনে হয় যে, মানুষ তাঁর প্রেম চায়—এবং সকল প্রেমের চেয়ে সেইটেকেই বড় সত্য, বড় লাভ বলে চায়। কেন চায়? কেন না মানুষ যে অধিকার পেয়েছে। এই প্রেমের দাবী যিনি জন্মিয়ে দিয়েছেন তাঁরই সঙ্গে যে প্রেম—এ'তে আর ভয় লজ্জা কিসের?

তিনি যে আমাকে একটি বিশেষ আমি করে তুলে সমস্ত জগৎ থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন এই খানেই যে আমার সকলের চেয়ে বড় দাবি—সমস্ত সূর্য্য চন্দ্র তারার চেয়ে বড় দাবি। সর্ব্বত্র বিশ্বের ভারাকর্ষণের টান আছে, আমার এই স্বাতন্ত্র্যটুকুর উপর তার কোনো টান নেই। যদি থাকৃত তা হলে সে যে এ'কে ধূলিরাশির সঙ্গে মিশিয়ে এক করে দিত।

প্রকাণ্ড জগতের চাপ এই আমিটুকুর উপর নেই বলেই এই আমিটি নিজের গৌরব রক্ষা করে কেমন মাথা তুলে চলেছে! পুরাণে বলে কাশী সমস্ত পৃথিবীর বাইরে। বস্তুত আমিই সেই কাশী। আমি জগতের মাঝখানে থেকে সমস্ত জগতের বাইরে।

সেই জন্যেই জগতের সঙ্গে নিজেকে ওজন করে ক্ষুদ্র বল্‌লে ত চল্‌বে না। তার সঙ্গে আমি ত তুলনীয় নই।

আমি যে একজন বিশেষ আমি। আমাতে

তাঁর শাসন নেই, আমাতে তাঁর বিশেষ আনন্দ। সেই আনন্দের উপরেই আমি আছি, বিশ্ব-নিয়মের উপরে নেই, এই জন্যেই এই আমির ব্যাপারটি একেবারে সৃষ্টিছাড়া। এই জন্যেই এই পরমাশ্চর্য্য আমির দিকেই তাকিয়ে উপনিষৎ বলে গিয়েছেন "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।" বলেছেন, এই আমি আর তিনি, সমান বৃক্ষের ডালে দুই পাখীর মত, দুই সখা একেবারে পাশাপাশি বসে আছেন।

তাঁর জগতের রাজ্যে আমাকে খাজনা দিতে হয়; এই জলস্থল আকাশ বাতাসের অনেক রকমের ট্যাক্‌স আছে সমস্তই আমাকে কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে হয়—যেখানে কিছু দেনা পড়ে সেই খানেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। কিন্তু আমার এই আমিটুকু একেবারে লাখেরাজ ঐ খানেই বন্ধুর মন্দির কি না, আমার সঙ্গে তাঁর কথা এই যে, তুমি ইচ্ছা করে আমাকে যা দেবে তাই নেব—যদি না দাও তবু

আমার যা দেবার তার থেকে বঞ্চিত করব না।

এমন যদি না হত তবে তাঁর জগৎরাজ্যের একলা রাজা হয়ে তাঁর আনন্দ কি হত! কোথাও যাঁর কোনো সমান নেই তিনি কি ভয়ঙ্কর একলা, কি অনন্ত একলা! তিনি ইচ্ছা করে কেবল প্রেমের জোরে এই একাধিপত্য এক জায়গায় পরিত্যাগ করেছেন। তিনি আমার এই আমিটুকুর কুঞ্জবনে বিশেষ করে নেমে এসেছেন—বন্ধু হয়ে আপনি ধরা দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, "আমার চন্দ্র সূর্যের সঙ্গে তোমার নিজের দামের হিসাব করতে হবে না! কেন না ওজন দরে তোমার দাম নয়। তোমার দাম আমার আনন্দের মধ্যে—তোমার সঙ্গেই আমার বিশেষ প্রেম বলেই তুমি তুমি হয়েছ!"

এইখানেই আমার এত গৌরব যে তাঁকে সুদ্ধ আমি অস্বীকার করতে পারি। বল্‌তে

পারি আমি তোমাকে চাইনে। সে কথা তাঁর ধূলি জলকে বল্‌তে গেলে তারা সহ্য করে না, তারা তখনি আমাকে মারতে আসে। কিন্তু তাঁকে যখন বলি, তোমাকে আমি চাইনে, আমি টাকা চাই, খ্যাতি চাই—তিনি বলেন আচ্ছা বেশ। বলে চুপ করে সরে বসে থাকেন!

এ দিকে কখন এক সময়ে হুঁস্ হয় যে আমার আত্মার যে নিভৃত নিকেতন, সেখানকার চাবি ত আমার খাতাঞ্চির হাতে নেই—টাকা কড়ি ধন দৌলৎ ত সেখানে কোনো মতে পৌঁছয় না! ফাঁক থেকেই যায়। সেখানকার সেই একলাঘরটি জগতের আর একটি মহান্ একলা ছাড়া কেউ কোনো মতেই ভরাতে পারে না। যে দিন বল্‌তে পারব আমার টাকায় কাজ নেই, খ্যাতিতে কাজ নেই, কিছুতে কাজ নেই, তুমি এস; যে দিন বল্‌তে পারব চন্দ্রসূর্য্যহীন আমার এই একলা ঘরটিতে

তুমি আমার আর আমি তোমার, সেই দিন আমার বরশয্যায় বর এসে বস্‌বেন—সেই দিন আমার আমি সার্থক হবে।

সে দিন একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার এই ঘট্‌বে যে, নিজেকে যতই দীন বলে জান্‌ব তাঁর প্রেমকে ততই বড় করে বুঝবো! তাঁর প্রেমের ঐশ্বর্য্যের উপলব্ধিতে তাঁর প্রেমকেই অনন্ত বলে জানব নিজেকে বড় করে দাঁড়াব না। জ্ঞান পেলে নিজেকে জ্ঞানী বলে গর্ব্ব হয় কিন্তু প্রেম পেলে নিজেকে অধম বলে জেনেও আনন্দ হয়। পাত্র যতই গভীররূপে শূন্য হয় সুধারসে ভরে উঠ্‌লে ততই সে বেশি করে পূর্ণ হয়। এই জন্যে প্রেম যখন লাভ করি তখন নিজেকে বড় করে জানাবার কোনো ইচ্ছাই হয় না—বরঞ্চ নিজের অত্যন্ত দীনতা নিজেকে অত্যন্ত সুখ দেয়—তখন তাঁর লীলার ভিতরকার একটি মস্ত বিরোধের সার্থকতা বুঝ্‌তে পারি এবং সেই বিরোধকে স্বীকার

করে আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি যে, জগতে আমি যতই ক্ষুদ্র যতই দীন দুর্ব্বল নিজের আমি-নিকেতনে তাঁর প্রেমের দ্বারা আমি ততই পরিপূর্ণ, ততই কৃতার্থ। আমি অনন্ত ভাবে দীন বলেই দুর্ব্বল বলেই তাঁর অনন্ত প্রেমের দ্বারা ধন্য হয়েছি।

১০ই পৌষ

ইচ্ছা

সকাল বেলা থেকেই আমার সংসারের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছি। কেন না, এ যে আমার সংসার। আমার ইচ্ছাটুকুই হচ্চে এই সংসারের কেন্দ্র। আমি কি চাই কি না চাই, আমি কাকে রাখ্ব কাকে ছাড়ব সেই কথাকে মাঝখানে নিয়েই আমার সংসার।

আমাকে বিশ্বভুবনের ভাবনা ভাবতে হয় না। আমার ইচ্ছার দ্বারা সূর্য্য উঠচে না, বায়ু বইচে না; অণুপরমাণুতে মিলন হয়ে বিচ্ছেদ হয়ে সৃষ্টিরক্ষা হচ্চে না। কিন্তু আমি নিজের ইচ্ছা শক্তিকে মূলে রেখে যে সৃষ্টি গড়ে তুলছি তার ভাবনা আমাকে সকলের চেয়ে বড় ভাবনা করেই ভাবতে হয় কেন না সেটা যে আমারই ভাবনা।

তাই এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপারের

ঠিক মাঝখানে থেকেও আমার এই অতি ছোট সংসারের অতি ছোট কথা আমার কাছে ছোট বলে মনে হয় না। আমার প্রভাতের সামান্য আয়োজন চেষ্টা প্রভাতের সুমহৎ সূর্য্যোদয়ের সম্মুখে লেশমাত্র লজ্জিত হয় না এমন কি, তাকে অনায়াসে বিস্মৃত হয়ে চল্‌তে পারে।

এই ত দেখতে পাচ্চি দুইটি ইচ্ছা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে কাজ করচে। একটি হচ্চে বিশ্ব-জগতের ভিতরকার ইচ্ছা, আর একটি আমার এই ক্ষুদ্র জগতের ভিতরকার ইচ্ছা। রাজা ত রাজত্ব করেন আবার তাঁর অধীনস্থ তালুক-দার, সেও সেই মহারাজ্যের মাঝখানেই আপ-নার রাজত্বটুকু বসিয়েছে। তার মধ্যেও রাজৈশ্বর্য্যের সমস্ত লক্ষণ আছে—কেন না ঐ ক্ষুদ্র সীমাটুকুর মধ্যে তার ইচ্ছা তার কর্ত্তৃত্ব বিরাজমান।

এই যে আমাদের আমি-জগতের মধ্যে

ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে রাজা করে দিয়েছেন—যে লোক রাস্তার ধূলো ঝাঁট দিচ্চে সেও তার আমি-অধিকারের মধ্যে স্বয়ং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—একথার আলোচনা পূর্ব্বে হয়ে গেছে। যিনি ইচ্ছাময় তিনি আমাদের প্রত্যেককে একটি করে ইচ্ছার তালুক দান করেছেন—দানপত্রে আছে "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ" আমরা এ'কে ভোগ করতে পারব।

আমাদের এই চিরন্তন ইচ্ছার অধিকার নিয়ে আমরা এক একবার অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে উঠে। বলি, যে, আমার নিজের ইচ্ছা ছাড়া আর কাউকেই মানিনে—এই বলে সকলকে লঙ্ঘন করার দ্বারাই আমার ইচ্ছা যে স্বাধীন এইটে আমরা স্পর্দ্ধার সঙ্গে অনুভব করতে চাই।

কিন্তু ইচ্ছার মধ্যে আর একটি তত্ত্ব আছে—স্বাধীনতায় তার চরম সুখ নয়। শরীর যেমন শরীরকে চায়, মন যেমন মনকে চায়,

বস্তু যেমন বস্তুকে আকর্ষণ করে—ইচ্ছা তেমনি ইচ্ছাকে না চেয়ে থাকতে পারে না। অন্য ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত না হতে পারলে এই একলা ইচ্ছা আপনার সার্থকতা অনুভব করে না। যেখানে কেবলমাত্র প্রয়োজনের কথা সেখানে জোর খাটানো চলে—জোর করে খাবার কেড়ে খেয়ে ক্ষুধা মেটে। কিন্তু ইচ্ছা যেখানে প্রয়োজনহীন, যেখানে অহেতুকভাবে সে নিজের বিশুদ্ধ স্বরূপে থাকে, সেখানে সে যা চায় তাতে একেবারেই জোর খাটে না, কারণ, সেখানে সে ইচ্ছাকেই চায়। সেখানে কোনো বস্তু, কোন উপকরণ, কোনো স্বাধীনতার গর্ব্ব, কোনো ক্ষমতা তার ক্ষুধা মেটাতে পারে না—সেখানে সে আর একটি ইচ্ছাকে চায়। সেখানে সে যদি কোনো উপহার সামগ্রীকে গ্রহণ করে তবে সেটাকে সামগ্রী বলে গ্রহণ করে না—যে ব্যক্তি দান করেছে তারই ইচ্ছার নিদর্শন বলে গ্রহণ করে—তার

ইচ্ছারই দামে এর দাম। মাতার সেবা যে ছেলের কাছে এত মূল্যবান সে ত কেবল সেবা বলেই মূল্যবান নয়, মাতার ইচ্ছা বলেই তার এত গৌরব ;—দাসের দাসত্ব নিয়ে আমার ইচ্ছার আকাঙ্ক্ষা মেটে না—বন্ধুর ইচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণের জন্যেই সে পথ চেয়ে থাকে।

এমনি করে ইচ্ছা যেখানে অন্য ইচ্ছাকে চায় সেখানে সে আর স্বাধীন থাকে না। সেখানে নিজেকে তার খর্ব্ব করতেই হয়। এমন কি, তাকে আমরা বলি ইচ্ছা বিসর্জ্জন দেওয়া। ইচ্ছার এই যে অধীনতা এমন অধীনতা আর নেই। দাসতম দাসকেও আমরা কাজে প্রবৃত্ত করতে পারি কিন্তু তার ইচ্ছাকে সমর্পণ করতে বাধ্য করতে পারিনে।

আমার যে সংসারে আমার ইচ্ছাই হচ্চে মূল কর্ত্তা সেখানে আমার একটা সর্ব্বপ্রধান কাজ হচ্চে অন্যের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা

সম্মিলিত করা। যত তা করতে পারব ততই আমার ইচ্ছার রাজ্য বিস্তৃত হতে থাকবে—আমার সংসার ততই বৃহৎ হয়ে উঠবে। সেই গৃহিণীই হচ্চে যথার্থ গৃহিণী যে পিতামাতা ভাই-বোন্ স্বামী পুত্র দাসদাসী পাড়া প্রতিবেশী সকলের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে সুসঙ্গত করে আপনার সংসারকে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যে গঠিত করে তুলতে পারে। এমন গৃহিণীকে সর্ব্বদাই নিজের ইচ্ছাকে খাটো করতে হয় ত্যাগ করতে হয় তবেই তার এই ইচ্ছাধিষ্ঠিত রাজ্যটি সম্পূর্ণ হয়। সে যদি সকলের সেবক না হয় তবে সে কর্ত্রী হতেই পারে না।

তাই বল্‌ছিলুম আমাদের যে ইচ্ছার মধ্যে স্বাধীনতার সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ স্বরূপ, সেই ইচ্ছার মধ্যেই অধীনতারও সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ মূর্ত্তি। ইচ্ছা, যে অহঙ্কারের মধ্যে আপনাকে স্বাধীন বলে প্রকাশ করেই সার্থক

হয় তা নয়, ইচ্ছা প্রেমের মধ্যে নিজেকে অধীন বলে স্বীকার করাতেই চরম সার্থকতা লাভ করে। ইচ্ছা আপনাকে উদ্যত করে নিজের যে ঘোষণা করে তাতেই তার শেষ কথা থাকে না, নিজেকে বিসর্জ্জন করার মধ্যেই তার পরম শক্তি চরম লক্ষ্য নিহিত।

ইচ্ছার এই যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম যে অন্য ইচ্ছাকে সে চায়, কেবল জোরের উপরে তার আনন্দ নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যেও সে ধর্ম্ম আমরা দেখ্‌তে পাচ্চি। তিনি ইচ্ছাকে চান। এই চাওয়াটুকু সত্য হবে বলেই তিনি আমার ইচ্ছাকে আমারই করে দিয়েছেন—বিশ্বনিয়মের জালে এ'কে একেবারে নিঃশেষে বেঁধে ফেলেন নি—বিশ্বসাম্রাজ্যে আর সমস্তই তাঁর ঐশ্বর্য্য, কেবল ঐ একটি জিনিষ তিনি নিজে রাখেন নি—সেটি হচ্চে আমার ইচ্ছা,—ঐটি তিনি কেড়ে নেন না—চেয়ে নেন, মন ভুলিয়ে নেন। ঐ একটি জিনিষ আছে যেটি আমি

তাঁকে সত্যই দিতে পারি। ফুল যদি দিই সে তাঁরই ফুল, জল যদি দিই সে তাঁরই জল— কেবল ইচ্ছা যদি সমর্পণ করি ত সে আমারই ইচ্ছা বটে!

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর আমার সেই ইচ্ছা-টুকুর জন্যে প্রতিদিন যে আমার দ্বারে আস্‌চেন আর যাচ্চেন তার নানা নিদর্শন আছে। এইখানে তিনি তাঁর ঐশ্বর্য্য খর্ব্ব করেচেন, কেননা এখানেই তাঁর প্রেমের লীলা। এইখানে নেমে এসেই তাঁর প্রেমের সম্পদ প্রকাশ করেচেন—আমারও ইচ্ছার কাছে তাঁর ইচ্ছাকে সঙ্গত করে তাঁর অনন্ত ইচ্ছাকে প্রকাশ করেচেন—কেননা ইচ্ছার কাছে ছাড়া ইচ্ছার চরম প্রকাশ হবে কোথায়? তিনি বল্‌চেন, রাজখাজনা নয়, আমাকে প্রেম দাও!

তোমাকে প্রেম দিতে হবে বলেই ত তুমি এত কাণ্ড করেচ! আমার মধ্যে এই এক

অদ্ভুত আমির লীলা ফেঁদে বসেছ—এবং আমাকে এই একটি ইচ্ছার সম্পদ্ দিয়ে সেটি পাবার জন্যে আমার কাছেও হাত পেতে দাঁড়িয়েছ!

১৮ই পৌষ

সৌন্দর্য্য

ঈশ্বর সত্যং। তাঁর সত্যকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। সত্যকে এতটুকুমাত্র স্বীকার না করলে আমাদের নিষ্কৃতি নেই। সুতরাং অমোঘ সত্যকে আমরা জলে স্থলে আকাশে সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পাচ্চি।

কিন্তু তিনি ত শুধু সত্য নন—তিনি আনন্দরূপমমৃতং। তিনি আনন্দরূপ, অমৃত-রূপ। সেই তাঁর আনন্দরূপকে দেখ্‌চি কোথায়?

আমি পূর্ব্বেই আভাস দিয়েছি আনন্দ স্বভাবতই মুক্ত। তার উপরে জোর খাটেনা, হিসাব চলে না। এই কারণে আমরা যেদিন আনন্দের উৎসব করি সেদিন প্রতিদিনের বাঁধা নিয়মকে শিথিল করে দিই—সেদিন

স্বার্থকে শিথিল করি, প্রয়োজনকে শিথিল করি, আত্মপরের ভেদকে শিথিল করি, সংসারের কঠিন সঙ্কোচকে শিথিল করি— তবেই ঘরের মাঝখানে এমন একটুখানি ফাঁকা জায়গা তৈরি হয় যেখানে আনন্দের প্রকাশ সম্ভবপর হয়। সত্য বাঁধনকেই মানে, আনন্দ বাঁধন মানে না।

এইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিতে সত্যের মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাই নিয়মে, এবং আনন্দের মূর্ত্তি দেখি সৌন্দর্য্যে। এইজন্য সত্যরূপের পরিচয় আমাদেব পক্ষে অত্যাবশ্যক, আনন্দরূপের পরিচয় আমাদের না হলেও চলে। প্রভাতে সূর্য্যোদয়ে আলো হয় এই কথাটা জানা এবং এটাকে ব্যবহারে লাগানো আমাদের নিতান্ত দরকার কিন্তু প্রভাত যে সুন্দর সুপ্রশান্ত এটুকু না জান্‌লে আমাদের কোনো কাজের কোনো ক্ষতিই হয় না।

জল স্থল আকাশ আমাদের নানা বন্ধনে

বদ্ধ করচে কিন্তু এই জল স্থল আকাশে নানা বর্ণে গন্ধে গীতে সৌন্দর্য্যের যে বিপুল বিচিত্র আয়োজন সে আমাদের কিছুতে বাধ্য করে না, তার দিকে না তাকিয়ে চলে গেলে সে আমাদের অরসিক বলে গালিও দেয় না।

অতএব দেখ্‌তে পাচ্চি, জগতের সত্য-লোকে আমরা বদ্ধ, সৌন্দর্য্যলোকে আমরা স্বাধীন। সত্যকে যুক্তির দ্বারা অখণ্ডনীয়রূপে প্রমাণ করতে পারি, সৌন্দর্য্যকে আমাদের স্বাধীন আনন্দ ছাড়া আর কিছুর দ্বারাই প্রমাণ করবার জো নেই। যে ব্যক্তি তুড়ি দিয়ে বলে "ছাই তোমার সৌন্দর্য্য!" মহাবিশ্বের লক্ষ্মীকেও তার কাছে একেবারে চুপ করে যেতে হয়। কোনো আইন নেই, কোনো পেয়াদা নেই যার দ্বারা এই সৌন্দর্য্যকে সে দায়ে পড়ে মেনে নিতে পারে।

অতএব জগতে ঈশ্বরের এই যে অপরূপ রহস্যময় সৌন্দর্য্যের আয়োজন এ আমাদের

কাছে কোনো মাশুল কোনো খাজনা আদায় করে না, ঐ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে চায়—বলে আমাতে তোমার আনন্দ হোক; তুমি স্বতঃ আমাকে গ্রহণ কর!

তাই আমি বল্‌ছিলুম, আমাদের অন্তরাত্মার আমি-ক্ষেত্রের একটা সৃষ্টিছাড়া নিকেতনে সেই আনন্দময়ের যে যাতায়াত আছে জগৎ-জুড়ে তার নিদর্শন পড়ে রয়েছে। আকাশের নীলিমায়, বনের শ্যামলতায়, ফুলের গন্ধে সর্ব্বত্রই তাঁর সেই পায়ের চিহ্ন ধরা পড়েছে যে! সেখানে যদি তিনি রাজবেশ ধরে আস্‌তেন তাহলে জোড়হাত করে তাঁকে মান্‌তুম—কিন্তু তিনি যে বন্ধুর বেশে ধীরপদে আসেন, একেবারে একলা আসেন, সঙ্গে তাঁর পদাতিকগুলো শাসনদণ্ড হাতে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে কেউ আসে না—সেইজন্যে পাপ ঘুম ভাঙতেই চায় না, দরজা বন্ধই থাকে।

কিন্তু এমন করলে ত চল্‌বে না—শাসনের

দায় নেই বলেই লক্ষ্মীছাড়া যদি প্রেমের দায় স্বেচ্ছায় সঙ্গে স্বীকার না করে তবে জন্মজন্ম সে কেবল দাস, দাসানুদাস হয়েই ঘুরে মরবে। মানবজন্ম যে আনন্দের জন্য সে খবরটা সে যে একেবারে পাবেই না! ওরে, অন্তরের যে নিভৃততম আবাসে চন্দ্রসূর্য্যের দৃষ্টি পৌঁছয় না, যেখানে কোনো অন্তরঙ্গ মানুষেরও প্রবেশপথ নেই, যেখানে কেবল একলা তাঁরই আসন-পাতা, সেইখানকার দরজাটা খুলে দে, আলো জ্বেলে তোল্! যেমন প্রভাতে সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি তাঁর আলোক আমাকে সর্ব্বাঙ্গে পরিবেষ্টন করে আছে যেন ঠিক তেম্‌নি প্রত্যক্ষ বুঝতে পারি তাঁর আনন্দ, তাঁর ইচ্ছা, তাঁর প্রেম আমার জীবনকে সর্ব্বত্র নীরন্ধ্র নিবিড়ভাবে পরিবৃত করে আছে। তিনিও পণ করে বসে আছেন তাঁর এই আনন্দমূর্ত্তি তিনি আমাদের জোর করে দেখাবেন না— বরঞ্চ তিনি প্রতিদিনই ফিরে ফিরে যাবেন,

বরঞ্চ তাঁর এই জগৎজোড়া সৌন্দর্য্যের আয়োজন প্রতিদিন আমার কাছে ব্যর্থ হবে তবু তিনি এতটুকু জোর করবেন না। যেদিন আমার প্রেম জাগ্‌বে সেদিন তাঁর প্রেম আর লেশমাত্র গোপন থাক্‌বে না। কেন যে আমি "আমি" হয়ে এতদিন এত দুঃখে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরেছি সেদিন সেই বিরহদুঃখের রহস্য একমুহূর্ত্তেই ফাঁস হয়ে যাবে।

১৯শে পৌষ

প্রার্থনার সত্য

কেউ কেউ বলেন উপাসনায় প্রার্থনার কোনো স্থান নেই—উপাসনা কেবলমাত্র ধ্যান। ঈশ্বরের স্বরূপকে মনে উপলব্ধি করা।

সে কথা স্বীকার করতে পারতুম যদি জগতে আমরা ইচ্ছার কোনো প্রকাশ না দেখ্‌তে পেতুম। আমরা লোহার কাছে প্রার্থনা করি নে, পাথরের কাছে প্রার্থনা করি নে—যার ইচ্ছাবৃত্তি আছে তার কাছেই প্রার্থনা জানাই।

ঈশ্বর যদি কেবল সত্যস্বরূপ হতেন, কেবল অব্যর্থ নিয়মরূপে তাঁর প্রকাশ হত তাহলে তাঁর কাছে প্রার্থনার কথা আমাদের কল্পনাতেও উদিত হতে পারত না। কিন্তু তিনি না কি আনন্দরূপমমৃতং, তিনি নাকি ইচ্ছাময়, প্রেমময়, আনন্দময়, সেইজন্যে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁকে আমরা জানি নে,

ইচ্ছার দ্বারাই তাঁর ইচ্ছাস্বরূপকে আনন্দ-স্বরূপকে জান্‌তে হয়।

পূর্ব্বেই বলেছি জগতে ইচ্ছার একটি নিদর্শন পেয়েছি সৌন্দর্য্যে। এই সৌন্দর্য্য আমাদের ইচ্ছাকে জাগ্রত করে এবং ইচ্ছার উপরেই তার নির্ভর। এইজন্য আমরা সৌন্দর্য্যকে উপকরণরূপে ব্যবহার করি প্রেমের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নয়। এইজন্য আমাদের সজ্জা, সঙ্গীত, সৌগন্ধ্য সেইখানেই, যেখানে ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার যোগ, আনন্দের সঙ্গে আনন্দের মিলন! জগদীশ্বর তাঁর জগতে এই অনাবশ্যক সৌন্দর্য্যের এমন বিপুল আয়োজন করেচেন বলেই আমাদের হৃদয় বুঝেচে জগৎ একটি মিলনের ক্ষেত্র—নইলে এখানকার এত সাজসজ্জা একেবারেই বাহুল্য।

জগতে হৃদয়েরও একটা বোঝবার বিষয় আছে, সে কথা একেবারে উড়িয়ে দিলে চল্‌বে কেন? একদিকে আলোক আছে বলেই

আমাদের চক্ষু আছে; একদিকে সত্য আছে বলেই আমাদের চৈতন্য আছে,—একদিকে জ্ঞান আছে বলেই আমাদের বুদ্ধি আছে; তেমনি আর একদিকে কি আছে আমাদের মধ্যে হৃদয় হচ্চে যার প্রতিরূপ? উপনিষৎ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন—রসোবৈ সঃ। তিনিই হচ্চেন রস—তিনিই আনন্দ।

পূর্ব্বেই আভাস দিয়েছি আমরা শক্তির দ্বারা প্রয়োজন সাধন করতে পারি, যুক্তির দ্বারা জ্ঞান লাভ করতে পারি কিন্তু আনন্দের সম্বন্ধে শক্তি এবং যুক্তি কেবল দ্বার পর্য্যন্ত এসে ঠেকে যায় —তাদের বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এই আনন্দের সঙ্গে একেবারে অন্তঃপুরের সম্বন্ধ হচ্চে ইচ্ছার। আনন্দে কানোরকম জোর খাটে না—সেখানে কেবল ইচ্ছা কেবল খুসি!

আমার মধ্যে এই ইচ্ছার নিকেতন হচ্চে হৃদয়। আমার সেই ইচ্ছাময় হৃদয় কি শূন্যে প্রতিষ্ঠিত? তার পুষ্টি হচ্চে মিথ্যায়, তার গম্য

স্থান হচ্চে ব্যর্থতার মধ্যে? তবে এই অদ্ভুত উপসর্গটা এল কোথা থেকে, এক মুহূর্ত আছে কোন্ উপায়ে? জগতের মধ্যে কি কেবল একটিমাত্রই ফাঁকি আছে? এবং সেই ফাঁকিটিই আমার এই হৃদয়?

কখনই নয়। আমাদের এই ইচ্ছা-রসময় হৃদয়টি জগদ্ব্যাপী ইচ্ছারসের নাড়ির সঙ্গে বাঁধা—সেইখান থেকেই সে আনন্দরস পেয়ে বেঁচে আছে—না পেলে তার প্রাণ বেরিয়ে যায়—সে অন্নবস্ত্র চায় না, বিদ্যাসাধ্য চায় না, অমৃত চায়, প্রেম চায়। যা চায় তা ক্ষুদ্ররূপে সংসারে এবং চরমরূপে তাঁতে আছে বলেই চায়—নইলে কেবল রুদ্ধদ্বারে মাথা খুঁড়ে মরবার জন্যে তার সৃষ্টি হয় নি!

অতএব হৃদয় আপনাকে জানে বলেই নিশ্চয় জানে তার একটি পরিপূর্ণ কৃতার্থতা অনন্তের মধ্যে আছে। ইচ্ছা কেবল তার দিকেই আছে তা নয়, অন্যদিকেও আছে—

অন্তরিক্ষে না থাক্‌লে সে নিমেষকালও থাকৃত না—এতটুকু কণামাত্রও থাকৃত না যাতে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণের ক্রিয়াটুকুও চল্‌তে পারে। সেই জন্যেই উপনিষৎ এত জোর করে' বলেছেন, "কোহ্যেবান্যাৎ কঃপ্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ, এষ হ্যেবানন্দয়াতি" কেই বা শরীরের চেষ্টা করত, কেই বা প্রাণধারণ করত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকৃতেন—ইনিই আনন্দ দেন।

ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার মাঝখানে দৌত্যসাধন করে প্রার্থনা। দুই ইচ্ছার মাঝখানে যে বিচ্ছেদ আছে সেই বিচ্ছেদের উপরে ব্যাকুল-বেশে দাঁড়িয়ে আছে ঐ প্রার্থনা দূতী। এই জন্যে অসাধারণ সাহসের সঙ্গে বৈষ্ণব বলেছেন —যে, জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য্যে ভগবানের বাঁশির যে নানা সুর বেজে উঠ্‌চে সে কেবল আমাদের জন্যে তাঁর প্রার্থনা—আমাদের হৃদয়কে তিনি এই অনির্ব্বচনীয় সঙ্গীতে ডাকে

দিয়ে চাচ্চেন—সেই জন্যেই ত এই সৌন্দর্য্য-সঙ্গীত আমাদের হৃদয়ের বিরহবেদনাকে জাগিয়ে তোলে।

সেই ইচ্ছাময় এম্‌নি মধুরস্বরে যেখানে আমাদের ইচ্ছাকে চাচ্চেন সেখানে তাঁর সমস্ত জোরকে একেবারে সম্বরণ করেছেন—যে প্রচণ্ড জোরে তিনি সৌরজগৎকে সূর্য্যের সঙ্গে অমোঘরূপে বেঁধে দিয়েছেন, সেই জোরের লেশমাত্র এখানে নেই—সেই জন্যে এমন করুণ এমন মধুর সুরে এমন নানা বিচিত্র রসে বাঁশি বাজচে—আহ্বানের আর অন্ত নেই।

তাঁর এমন আহ্বানে আমাদেরও মনের প্রার্থনা কি জাগবে না? সে কি তার বিরহের ধূলি-আসনে লুটিয়ে কেঁদে উঠ্‌বে না? অসত্য অন্ধকার এবং মৃত্যুর নিরানন্দ নির্ব্বাসন থেকে অভিসার যাত্রার সময়ে এই প্রার্থনা দূতীই কি তার কম্পিত দীপশিখাটি নিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে চল্‌বে না?

প্রার্থনার সত্য

যতদিন আমাদের হৃদয় আছে, যতদিন প্রেমস্বরূপ ভগবান তাঁর নানাসৌন্দর্য্য দ্বারা এই জগৎকে আনন্দনিকেতন করে সাজাচ্ছেন, ততদিন তাঁর সঙ্গে মিলন না হলে মানুষের বেদনা ঘুচ্‌বে কি করে? ততদিন কোন্ সন্দেহকঠোর জ্ঞানাভিমান মানুষের প্রার্থনাকে অপমানিত করে ফিরিয়ে দিতে পারে!

এই আমাদের প্রার্থনাটি যে বিশ্বমানবের অন্তরের পঙ্কশয্যা থেকে ব্যাকুল শতদলের মত তার সমস্ত জলরাশির আবরণ ঠেলে আলোকের অভিমুখে মুখ তুলচে—তার সমস্ত সৌগন্ধ্য এবং শিশিরাশ্রুসিক্ত সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে বল্‌চে—অসতোমা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। মানবহৃদয়ের এই পরিপূর্ণ প্রার্থনার পূজোপহারটিকে মোহ বলে তিরস্কৃত করতে পারে এত বড় নিদারুণ শুষ্কতা কার আছে?

২০শে পৌষ

বিধান

এই ইচ্ছা প্রেম আনন্দের কথাটা উঠ্‌লেই তার উল্টো কথাটা এসে মনের মধ্যে আঘাত করতে থাকে। সে বলে তবে এত শাসন বন্ধন কেন? যা চাই তা পাইনে কেন, যা চাইনে তা ঘাড়ে এসে পড়ে কেন?

এইখানে মানুষ তর্কের দ্বারা নয় কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা এর উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে। সে বলেছে "স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা।"

অর্থাৎ যিনি আমাকে প্রকাশ করেছেন "স এব বন্ধুঃ" তিনি ত আমার বন্ধু হবেনই। আমাতে যদি তাঁর আনন্দ না থাকৃত তবে ত আমি থাকৃতুমই না। আবার "স বিধাতা।" বিধাতা আর দ্বিতীয় কেউ নয়—যিনি জনিতা, তিনিই বন্ধু, বিধানকর্ত্তাও তিনি—অতএব বিধান যাই হোক মূলে কোনো ভয় নেই।

কিন্তু বিধান জিনিষটা ত খামখেয়ালি হলে চলে না; আজ একরকম কাল অন্যরকম—আমার পক্ষে একরকম অন্যের পক্ষে অন্যরকম—কখন কি রকম তার কোনো স্থিরতা নেই, এ ত বিধান নয়। বিধান যে বিশ্ববিধান।

এই বিধানের অবিচ্ছিন্ন সূত্রে এই পৃথিবীর ধূলি থেকে নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত এক সঙ্গে গাঁথা রয়েছে। আমার সুখ সুবিধার জন্য যদি বলি, তোমার বিধানের সূত্র এক জায়গায় ছিন্ন করে দাও—এক জায়গায় অন্য সকলের সঙ্গে আমার নিয়মের বিশেষ পার্থক্য করে দাও তাহলে বস্তুত বলা হয় যে এই কাদাটুকু পার হতে আমার কাপড়ে দাগ লাগছে অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডের মণিহারের ঐক্যসূত্রটিকে ছিঁড়ে সমস্ত সূর্য্যতারাকে রাস্তায় ছড়িয়ে ফেলে দাও!

এই বিধান জিনিষটা কারো একলার নয় এবং কোনো একখণ্ড সময়ের নয়—এই বিশ্ববিধানের যোগেই সমষ্টির সঙ্গে আমরা

প্রত্যেকে যুক্ত হয়ে আছি এবং কোনো কালে সে যোগের বিচ্ছেদ নেই। উপনিষৎ বলেছেন যিনি বিশ্বের প্রভু, তিনি "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্য সমাভ্যঃ" তিনি নিত্যকাল হতে এবং নিত্যকালের জন্য সমস্তই যথার্থরূপে বিধান করছেন। এই বিধানের মূলে শাশ্বতকাল—এ বিধান অনাদি অনন্তকালের বিধান—তারপরে আবার এই বিধান যাথাতথ্যতঃ বিহিত হচ্চে—এর আদ্যোপান্তই যথাতথ—কোথাও ছেদ নেই, অসঙ্গতি নেই। আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র বিশ্ববিধান সম্বন্ধে এর চেয়ে জোর করে এবং পরিষ্কার করে কিছু বলে নি।

কিন্তু শুধু তাই যদি হয়, যদি কেবল অমোঘ নিয়মের লৌহ সিংহাসনে তিনি কেবল বিধাতা-রূপেই বসে থাকেন—তাহলে ত সেই বিধাতার সামনে আমরা কাঠ পাথর ধূলি-বালিরই সমান হই। তাহলে ত আমরা শিকলে বাঁধা বন্দী।

কিন্তু তিনি শুধু ত বিধাতা নন, "স এব বন্ধুঃ"—তিনিই যে বন্ধু।

বিধাতার প্রকাশ ত বিশ্বচরাচরে দেখছি, বন্ধুর প্রকাশ কোন খানে? বন্ধুর প্রকাশ ত নিয়মের ক্ষেত্রে নয়—সে প্রকাশ আমার অন্তরের মধ্যে প্রেমের ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোথায় হবে?

বিধাতার কর্ম্মক্ষেত্র এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে—আর বন্ধুর আনন্দনিকেতন আমার জীবাত্মায়।

মানুষ একদিকে প্রকৃতি আর একদিকে আত্মা—একদিকে রাজার খাজনা জোগায় আর একদিকে বন্ধুর ডালি সাজায়। একদিকে সত্যের সাহায্যে তাকে মঙ্গল পেতে হয়, আর একদিকে মঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাকে সুন্দর হয়ে উঠ্‌তে হয়।

ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে নিয়মরূপে প্রকাশ পায় সেইদিকে প্রকৃতি—আর ঈশ্বরের ইচ্ছা

যে দিকে আনন্দরূপে প্রকাশ পায় সেই দিকে আত্মা।. এই প্রকৃতির ধর্ম্ম, বন্ধন—আর আত্মার ধর্ম্ম, মুক্তি। এই সত্য এবং আনন্দ, বন্ধন এবং মুক্তি তাঁর বাম এবং দক্ষিণ বাহু। এই দুই বাহু দিয়েই তিনি মানুষকে ধরে রেখেছেন।

যেদিকে আমি ইট কাঠ গাছ পাথরের সমান সেই সাধারণ দিকে ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপী নিয়ম কোনো মতেই আমাকে সাধারণ থেকে লেশমাত্র তফাৎ হতে দেয় না—আর যেদিকে আমি বিশেষ ভাবে আছি সেই স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঈশ্বরের বিশেষ আনন্দ কোনো মতেই আমাকে সকলের সঙ্গে মিলে যেতে দেয় না। বিধাতা আমাকে সকলের করেছেন আর বন্ধু আমাকে আপনার করেছেন—সেই সকলের সামগ্রী আমার প্রকৃতি, আর সেই তাঁর আপনার সামগ্রী আমার জীবাত্মা।

২১শে পৌষ।

তিন

প্রকৃতির দিকে নিয়ম, আর আমাদের আত্মার দিকে আনন্দ। নিয়মের দ্বারাই নিয়মের সঙ্গে এবং আনন্দের দ্বারাই আনন্দের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে।

এইজন্ত যেদিকে আমি সর্ব্বসাধারণের, যেদিকে আমি বিশ্বপ্রকৃতির, যেদিকে আমি মানব প্রকৃতির, সেদিকে যদি আমি নিজেকে নিয়মের অনুগত না করি তাহলে আমি কেবলই ব্যর্থ হই এবং অশান্তির সৃষ্টি করি। একটি ধূলিকণার কাছ থেকেও আমি ভুলিয়ে কাজ আদায় করতে পারিনে—তার নিয়ম আমি মান্‌লে তবেই সে আমার নিয়ম মানে।

এই জন্তে আমাদের প্রথম শিক্ষা হচ্চে প্রকৃতির নিয়ম শিক্ষা এবং নিজেকে নিয়মের অনুগত করতে শেখা। এই শিক্ষার দ্বারাই আমরা সত্যের পরিচয় লাভ করি।

এই শিক্ষাটির পরিণাম যিনি তিনিই হচ্চেন "শান্তম্"। যেখানেই নিয়মের ভ্রষ্টতা যেখানেই নিয়মের সঙ্গে নিয়মের যোগ হয়নি সেই খানেই অশান্তি। যেখানেই পরিপূর্ণ যোগ হয়েছে সেখানেই শান্তম্ যিনি, তাঁর পরিপূর্ণ উপলব্ধি।

প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের কোন্ স্বরূপ দেখতে পাই? তাঁর শান্তস্বরূপ। সেখানে, যারা ক্ষুদ্র করে দেখে তারা প্রয়াসকে দেখে, যারা বৃহৎ করে দেখে তারা শান্তিকেই দেখতে পায়। যদি নিয়ম ছিন্ন হত, যদি নিয়ম শাশ্বত এবং যথাতথ না হত, তাহলে মুহূর্ত্তের মধ্যে এই বিপুল বিশ্বশান্তি ধ্বংস হয়ে একটি অর্থহীন পরিণামহীন প্রলয়ের প্রচণ্ড নৃত্য আরম্ভ হত, তাহলে বিশ্বসংসারে বিরোধই জয়ী হয়ে তার নখদন্ত দিয়ে সমস্ত ছিন্নভিন্ন করে ফেল্‌ত। কিন্তু চেয়ে দেখ, সূর্য্যনক্ষত্রলোকের প্রবল উত্তেজনার মধ্যে অটল নিয়মাসনে মহাশান্তি

বিরাজ করচেন। সত্যের স্বরূপই হচ্চে শান্তম্।

সত্য শান্তম্ বলেই শিবম্। শান্তম্ বলেই তিনি সকলকে ধারণ করেন, রক্ষা করেন, সকলেই তাঁতে ধ্রুব আশ্রয় পেয়েছে। আমরাও যেখানে সংযত না হয়েছি অর্থাৎ যেখানে সত্যকে জানিনি এবং সত্যের সঙ্গে সত্যরক্ষা করে চলিনি সেখানে আমাদের অন্তরে বাহিরে অশান্তি এবং সেই অশান্তিই অমঙ্গল—নিয়মের সঙ্গে নিয়মের বিচ্ছেদই অশিব।

যিনি শিবম্ তাঁর মধ্যেই অদ্বৈতম্ প্রকাশমান। সত্য যেখানে শিবস্বরূপ, সেইখানেই তিনি আনন্দময় প্রেমময়, সেইখানেই তাঁর সকলের সঙ্গে মিলন। মঙ্গলের মধ্যে ছাড়া মিলন নেই—অমঙ্গলই হচ্চে বিরোধ বিচ্ছেদের অপদেবতা।

একদিকে সত্য অন্যদিকে আনন্দ, মাঝখানে মঙ্গল। তাই এই মঙ্গলের মধ্যে দিয়েই আমাদের আনন্দলোকে যেতে হয়।

আমাদের দেশে যে তিন আশ্রম ছিল— ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ, তাহা ঈশ্বরের এই তিন স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত। শান্ত-স্বরূপ, শিবস্বরূপ, অদ্বৈতস্বরূপ।

ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা জীবনে শান্তস্বরূপকে লাভ করলে তবে গৃহধর্ম্মের মধ্যে শিবস্বরূপকে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়—নতুবা গার্হস্থ্য অকল্যাণের আকর হয়ে ওঠে। সংসারে সেই মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করতে হলেই স্বার্থ-বৃত্তিসকল সম্পূর্ণ পরাহত হয় এবং যথার্থ মিলনের ধর্ম্ম যে কিরূপ নির্ম্মল আত্মবিসর্জ্জনের উপরে স্থাপিত তা আমরা বুঝতে পারি। যখন তা সম্পূর্ণ বুঝি তখনই যিনি অদ্বৈতম্ সেই ঐক্যরূপী পরমাত্মার সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার বাধাহীন প্রেমের মিলন সম্ভবপর হয়। আরম্ভে সত্যের পরিচয়, মধ্যে মঙ্গলের পরিচয়, পরিণামে আনন্দের পরিচয়। প্রথমে জ্ঞান, পরে কর্ম্ম, পরে প্রেম।

তিন

এইজন্তে যেমন আমাদের ধ্যানের মন্ত্র শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—তেমনি আমাদের প্রার্থনার মন্ত্র "অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়।" অসত্য হতে সত্যে, পাপ হতে পুণ্যে এবং আসক্তি হতে প্রেমে নিয়ে যাও। তবেই হে প্রকাশ, তুমি আমার প্রকাশ হবে, তবেই হে রুদ্র, আমার জীবনে তুমি প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌বে!

সত্যে শেষ নয়, মঙ্গলে শেষ নয়, অদ্বৈতেই শেষ। জগৎপ্রকৃতিতে শেষ নয়, সমাজ-প্রকৃতিতেও শেষ নয়, পরমাত্মাতেই শেষ, এই হচ্চে আমাদের ভারতবর্ষের বাণী—এই বাণীটিকে জীবনে যেন সার্থক করতে পারি এই আমাদের প্রার্থনা হোক্!

২১শে পৌষ

পার্থক্য

ঈশ্বর যে কেবল মানুষকেই পার্থক্য দান করেছেন আর প্রকৃতির সঙ্গে মিলে এক হয়ে রয়েচেন একথা বল্লে চল্‌বে কেন? প্রকৃতির সঙ্গেও তাঁর একটি স্বাতন্ত্র্য আছে নইলে প্রকৃতির উপরে তাঁর ত˚ কোনো ক্রিয়া চল্‌ত না।

তফাৎ এই যে, মানুষ জানে সে স্বতন্ত্র— শুধু তাই নয়, সে এও জানে যে ঐ স্বাতন্ত্র্যে তার অপমান নয় তার গৌরব। বাপ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেকে নিজের তহবিল থেকে একটি স্বতন্ত্র তহবিল করে দেন তখন এই পার্থক্যের দ্বারা তাকে তিরস্কৃত করেন না— বস্তুত এই পার্থক্যেই তাঁর একটি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ পায় এবং এই পার্থক্যের মহা-গৌরবটুকু মানুষ কোনোমতেই ভুল্‌তে পারে না।

মানুষ নিজের সেই স্বাতন্ত্র্য-গৌরবের অধিকারটি নিয়ে নিজে ব্যবহার করচে। প্রকৃতির মধ্যে সেই অহঙ্কার নেই, সে জানে না সে কি পেয়েছে।

ঈশ্বর এই প্রকৃতিকে কি দিয়ে পৃথক্ করে দিয়েছেন? নিয়ম দিয়ে।

নিয়ম দিয়ে না যদি পৃথক্ করে দিতেন তা হলে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ইচ্ছার যোগ থাকৃত না। একাকার হয়ে থাকৃলে ইচ্ছার গতিবিধির পথ থাকে না।

যে লোক দাবাবড়ে খেলায় নিজের ইচ্ছাকে প্রয়োগ করতে চায় সে প্রথমে নিজের ইচ্ছাকে বাধা দেয়। কেমন করে'? নিয়ম রচনা করে'। প্রত্যেক ঘুঁটিকে সে নিয়মে বদ্ধ করে' দেয়। এই যে নিয়ম এ বস্তুত ঘুঁটির মধ্যে নেই—যে খেলবে তারই ইচ্ছার মধ্যে। ইচ্ছা নিজেই নিয়ম স্থাপন করে' সেই নিয়মের উপরে নিজেকে প্রয়োগ করতে থাকে তবেই খেলা সম্ভব হয়।

বিশ্বজগতে ঈশ্বর জলের নিয়ম, স্থলের নিয়ম, বাতাসের নিয়ম, আলোর নিয়ম, মনের নিয়ম, নানা প্রকার নিয়ম বিস্তার করে দিয়েছেন। এই নিয়মকেই আমরা বলি সীমা। এ সীমা প্রকৃতি কোথাও থেকে মাথায় করে এনেছে, তা ত নয়। তাঁর ইচ্ছাই নিজের মধ্যে এই নিয়মকে এই সীমাকে স্থাপন করেছে—নতুবা, ইচ্ছা বেকার থাকে, কাজ পায় না। এই জন্যই যিনি অসীম তিনিই সীমার আকর হয়ে উঠেছেন—কেবলমাত্র ইচ্ছার দ্বারা, আনন্দের দ্বারা। সেই কারণেই উপনিষৎ বলেন "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" সেইজন্যই বলেন "আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি" যিনি প্রকাশ পাচ্ছেন তাঁর যা কিছু রূপ তা আনন্দরূপ—অর্থাৎ মূর্তিমান ইচ্ছা—ইচ্ছা আপনাকে সীমায় বেঁধেছে, রূপে বেঁধেছে।

প্রকৃতিতে ঈশ্বর নিয়মের দ্বারা সীমার দ্বারা

যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন সে যদি কেবল-মাত্রই পার্থক্য হত তাহলে জগৎ ত সমষ্টিরূপ ধারণ করত না। তাহলে অসংখ্য বিচ্ছিন্নতা এমনি বিচ্ছিন্ন হত যে কেবলমাত্র সংখ্যাসূত্রেও তাদের একাকারে জানবার কিছুই থাকত না।

অতএব এর মধ্যে আর একটি জিনিষ আছে যা এই চিরন্তন পার্থক্যকে চিরকালই অতিক্রম করচে। সেটি কি? সেটি হচ্চে শক্তি। ঈশ্বরের শক্তি এই সমস্ত পার্থক্যের উপর কাজ করে এ'কে এক অভিপ্রায়ে বাঁধছে। সমস্ত স্বতন্ত্র নিয়মবদ্ধ দাবাবড়ের ঘুঁটির মধ্যে একই খেলোয়াড়ের শক্তি একটি এক-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট খেলাকে অভিব্যক্ত করে তুলচে।

এইজন্যেই তাঁকে ঋষিরা বলেচেন "কবিঃ"। কবি যেমন ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে নিজের ইচ্ছার অধীনে নিজের শক্তির অনুগত করে সুন্দর ছন্দোবিন্যাসের ভিতর দিয়ে একটি আশ্চর্য্য অর্থ

উদ্ভাবিত করে তুল্চে—তিনিও তেমনি "বহুধা-শক্তি যোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি" অর্থাৎ শক্তিকে বহুর মধ্যে চালিত করে বহুর সঙ্গে যুক্ত করে অনেক বর্ণের ভিতর থেকে একটি নিহিত অর্থ ফুটিয়ে তুল্চেন—নইলে সমস্তই অর্থহীন হত।

"শক্তি যোগাৎ" শক্তি যোগের দ্বারা। শক্তি একটি যোগ। এই যোগের দ্বারাই ঈশ্বর সীমাদ্বারা পৃথক্‌কৃত প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হচ্চেন—নিয়মের সীমারূপ পার্থক্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর শক্তি দেশের সঙ্গে দেশান্তরের, রূপের সঙ্গে রূপান্তরের, কালের সঙ্গে কালান্তরের বহুবিচিত্রসংযোগ সাধন করে এক অপূর্ব্ব বিশ্বকাব্য সৃজন করে চলেছে।

এম্‌নি করে' যিনি অসীম তিনি সীমার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করচেন, যিনি অকাল-স্বরূপ খণ্ডকালের দ্বারা তাঁর প্রকাশ চলেছে। এই পরমাশ্চর্য্য রহস্যকেই বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে

পরিণামবাদ। যিনি আপনাতেই আপনি পর্য্যাপ্ত তিনি ক্রমের ভিতর দিয়ে নিজের ইচ্ছাকে বিচিত্ররূপে মূর্ত্তিমান করচেন—জগৎ-রচনায় করচেন, মানবসমাজের ইতিহাসে করচেন।

প্রকৃতির মধ্যে নিয়মের সীমাই হচ্চে পার্থক্য, আর আত্মার মধ্যে অহঙ্কারের সীমাই হচ্চে পার্থক্য। এই সীমা যদি তিনি স্থাপিত না করতেন তাহলে তাঁর প্রেমের লীলা কোনোমতে সম্ভবপর হত না। জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়ে তাঁর প্রেম কাজ করচে। তাঁর শক্তির ক্ষেত্র হচ্চে নিয়মবদ্ধ প্রকৃতি, আর তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র হচ্চে অহঙ্কারবদ্ধ জীবাত্মা। এই অহঙ্কারকে জীবাত্মার সীমা বলে তাকে তিরস্কার করলে চল্‌বে না। জীবাত্মার এই অহঙ্কারে পরমাত্মা নিজের আনন্দের মধ্যে সীমা স্থাপন করেছেন—নতুবা তাঁর আনন্দের কোনো কর্ম্ম থাকে না।

এই অহংকারে যদি কেবল পার্থক্যই সর্ব্ব-প্রধান হত তাহলে আত্মীয় আত্মায় বিরোধ হবার মতও সংঘাত ঘট্‌তে পারত না—আত্মার সঙ্গে আত্মার কোনো দিক থেকে কোনো সংস্পর্শই থাক্‌তে পারত না। কিন্তু তাঁর প্রেম সমস্ত আত্মাকে আত্মীয় করবার পথে চলেছে, পরস্পরকে যোজনা করে প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যের নিহিতার্থটিকে জাগ্রত করে তুলচে। নতুবা জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য ভয়ঙ্কর নিরর্থক হত।

এখানেও সেই আশ্চর্য্য রহস্য। পরিপূর্ণ আনন্দ অপূর্ণের দ্বারাই আপনার আনন্দলীলা বিকশিত করে তুল্‌চেন। বহুতর দুঃখ সুখ বিচ্ছেদ মিলনের ভিতর দিয়ে ছায়ালোকবিচিত্র এই প্রেমের অভিব্যক্তি কেবলি অগ্রসর হচ্চে। স্বার্থ ও অভিমানের ঘাত প্রতিঘাতে কত আঁকা বাঁকা পথ নিয়ে, কত বিস্তারের মধ্যে দিয়ে, ছোট বড় কত আসক্তি অনুরক্তিকে

বিদীর্ণ করে জীবাত্মার প্রেমের নদী প্রেম সমুদ্রের দিকে গিয়ে মিলচে। প্রেমের শতদল পদ্ম অহঙ্কারের বৃন্ত আশ্রয় করে আত্ম হতে গৃহে, গৃহ হতে সমাজে, সমাজ হতে দেশে, দেশ হতে মানবে, মানব হতে বিশ্বাত্মায় ও বিশ্বাত্মা হতে পরমাত্মায় একটি একটি করে পাপড়ি খুলে দিয়ে বিকাশের লীলা সমাধান করচে।

২৩শে পৌষ

প্রকৃতি

প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তির ক্ষেত্র, আর জীবাত্মা তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র একথা বলা হয়েছে। প্রকৃতিতে শক্তির দ্বারা তিনি নিজেকে 'প্রচার' করছেন, আর জীবাত্মায় প্রেমের দ্বারা তিনি নিজেকে 'দান' করছেন।

অধিকাংশ মানুষ এই দুই দিকে ওজন সমান রেখে চলতে পারে না। কেউ বা প্রাকৃতিক দিকেই সাধনা প্রয়োগ করে, কেউ বা আধ্যাত্মিক দিকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যেও এসম্বন্ধে ভিন্নতা প্রকাশ পায়।

প্রকৃতির ক্ষেত্রে যাদের সাধনা তারা শক্তি লাভ করে, তারা ঐশ্বর্য্যশালী হয়, তারা রাজ্য সাম্রাজ্য বিস্তার করে। তারা অন্নপূর্ণার বরলাভ করে' পরিপুষ্ট হয়।

তারা সর্ব্ববিষয়ে বড় হয়ে ওঠবার জন্যে

পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে একটা খুব বড় জিনিষ লাভ করে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁদের শ্রেষ্ঠলাভ হচ্ছে ধর্ম্মনীতি।

কারণ, বড় হয়ে উঠ্‌তে গেলে, শক্তিশালী হয়ে উঠতে গেলেই অনেকের সঙ্গে মিলতে হয়। এই মিলন সাধনের উপরেই শক্তির সার্থকতা নির্ভর করে। কিন্তু বড় রকমে, স্থায়ী রকমে, সকলের চেয়ে সার্থক রকমে, মিল্‌তে গেলেই এমন একটি নিয়মকে স্বীকার করতে হয় যা মঙ্গলের নিয়ম--অর্থাৎ বিশ্বের নিয়ম—অর্থাৎ ধর্ম্মনীতি। এই নিয়মকে স্বীকার করলেই সমস্ত বিশ্ব আনুকূল্য করে—যেখানে অস্বীকার করা যায় সেই খানেই সমস্ত বিশ্বের আঘাত লাগতে থাকে—সেই আঘাত লাগ্‌তে লাগ্‌তে কোন্ সময়ে যে ছিদ্র দেখা দেয় তা চোখেই পড়ে না—অবশেষে বহুদিনের কীর্ত্তি দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভূমিসাৎ হয়ে যায়।

যাঁরা শক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে কাজ করেন তাঁদের বড় বড় সাধকেরা এই নিয়মকে বিশেষ করে আবিষ্কার করেন। তাঁরা জানেন নিয়মই শক্তির প্রতিষ্ঠাস্থল, তা ঈশ্বরের সম্বন্ধেও যেমন মানুষের সম্বন্ধেও তেমনি। নিয়মকে যেখানে লঙ্ঘন করব শক্তিকে সেই খানেই নিরাশ্রয় করা হবে। যার আপিসে নিয়ম নেই সে অশক্ত কর্ম্মী। যার গৃহে নিয়ম নেই সে অশক্ত গৃহী। যে রাষ্ট্রব্যাপারে নিয়ম লঙ্ঘন হয় সেখানে অশক্ত শাসনতন্ত্র। যার বুদ্ধি বিশ্বব্যাপারে নিয়মকে দেখতে পায় না সে জীবনের সর্ব্ব বিষয়েই অশক্ত, অকৃতার্থ, পরাভূত।

এইজন্য যথার্থ শক্তির সাধকেরা নিয়মকে বুদ্ধিতে স্বীকার করেন, বিশ্বে স্বীকার করেন, নিজের কর্ম্মে স্বীকার করেন। এই জন্যেই তাঁরা যোজনা করতে পারেন, রচনা করতে পারেন, লাভ করতে পারেন। এইরূপে তাঁরা

যে পরিমাণে সত্যশালী হন সেই পরিমাণেই ঐশ্বর্য্যশালী হয়ে উঠ্‌তে থাকেন।

কিন্তু এর একটি মুস্কিল হচ্চে এই যে, অনেক সময়ে তাঁরা এই ধর্ম্মনীতিকেই মানুষের শেষ সম্বল বলে জ্ঞান করেন। যার সাহায্যে কেবলি কর্ম্ম করা যায়, কেবলি শক্তি, কেবলি উন্নতি লাভ করা যায় সেইটেকেই তাঁরা চরম শ্রেয় বলে জানেন। এইজন্য বৈজ্ঞানিক সত্যকেই তাঁরা চরম সত্য বলে জ্ঞান করেন এবং সকল কর্ম্মের আশ্রয়ভূত ধর্ম্মনীতিকেই তাঁরা পরম পদার্থ বলে অনুভব করেন।

কিন্তু যারা শক্তির ক্ষেত্রেই তাদের সমস্ত পাওয়াকে সীমাবদ্ধ করে রাখে তারা ঐশ্বর্য্যকে পায় ঈশ্বরকে পায় না। কারণ ঈশ্বর সেখানে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে নিজের ঐশ্বর্য্যকে উদ্‌ঘাটন করেছেন।

এই অনন্ত ঐশ্বর্য্যসমুদ্র পার হয়ে ঈশ্বরে গিয়ে পৌঁছবে এমন সাধ্য কার আছে!

ঐশ্বর্য্যের ত অন্ত নেই, শক্তিরও শেষ নেই। সেইজন্যে ওপথে ক্রমাগতই অন্তহীন একের থেকে আরের দিকে চল্‌তে হয়। সেই জন্যেই মানুষ এই রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে বল্‌তে থাকে— ঈশ্বর নেই, কেবলি এই আছে, এবং এই আছে; আর আছে, এবং আরো আছে।

ঈশ্বরের সমান না হতে পারলে তাঁকে উপলব্ধি করব কি করে? আমরা যতই রেল গাড়ি চালাই আর টেলিগ্রাফের তার বসাই, শক্তিক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বর হতে অনন্ত দূরে থেকে যাই। যদি স্পর্দ্ধা করে তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের চেষ্টা আপন অধিকারকে লঙ্ঘন করে ব্যাসকাশীর মত অভিশপ্ত এবং বিশ্বামিত্রের সৃষ্টজগতের মত বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

এইজন্যই জগতের সমস্ত ধর্ম্মসাধকেরা বারম্বার বলেছেন ঐশ্বর্য্যপথের পথিকদের পক্ষে ঈশ্বরদর্শন অত্যন্ত দুঃসাধ্য। অন্তহীন চেষ্টা

চরমতাহীন পথে তাদের কেবলি ভুলিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যায়।

অতএব ঈশ্বরকে বাহিয়ে অর্থাৎ তাঁর শক্তির ক্ষেত্রে কোনো জায়গায় আমরা লাভ করতে পারিনে। সেখানে যে বালুকণাটির অন্তরালে তিনি রয়েছেন সেই বালুকণাটিকে নিঃশেষে অতিক্রম করে এমন সাধ্য কোনো বৈজ্ঞানিকের কোনো যান্ত্রিকের নেই। অতএব শক্তির ক্ষেত্রে যে লোক ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করতে যায় সে অর্জ্জুনের মত ছদ্মবেশী মহাদেবকে বাণ মারে—সে বাণ তাঁকে স্পর্শ করে না—সেখানে না হেরে উপায় নেই।

এই শক্তির ক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বরের দুই মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাই—এক হচ্চে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি—এই মূর্ত্তি ঐশ্বর্য্যের দ্বারা আমাদের শক্তিকে পরিপুষ্ট করে তোলে; আর এক হচ্চে কঙ্কালী কালী মূর্ত্তি—এই মূর্ত্তি আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তিকে সংহরণ করে নেয়; আমাদের কোনো

দিক্ দিয়ে শক্তির চরমতায় যেতে দেয় না—না টাকায়, না খ্যাতিতে, না অন্য কোনো বাসনার বিষয়ে। বড় বড় রাজ্যসাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হয়ে যায়—বড় বড় ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার ভুক্তশেষ নারিকেলের খোলার মত পড়ে থাকে। এখানে পাওয়ার মূর্ত্তি খুব সুন্দর, উজ্জ্বল এবং মহিমান্বিত, কিন্তু যাওয়ার মূর্ত্তি, হয় বিষাদে পরিপূর্ণ নয় ভয়ঙ্কর। তা শূন্যতার চেয়ে শূন্যতর, কারণ, তা পূর্ণতার অন্তর্দ্ধান।

কিন্তু যেমনি হোক্ এখানে পাওয়াও চরম নয়, যাওয়াও চরম নয়—এখানে পাওয়া এবং যাওয়ার আবর্ত্তন কেবলি চলেছে। সুতরাং এই শক্তির ক্ষেত্র মানুষের স্থিতির ক্ষেত্র নয়; এর কোনোখানে এসে মানুষ চিরদিনের মত বলে না যে এইখানে পৌঁছন গেল।